দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৭ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা।। ১৪ এপ্রিল, ২০২৫
৩১ চৈত্র, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৭

নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা

website : www.eswastika.com

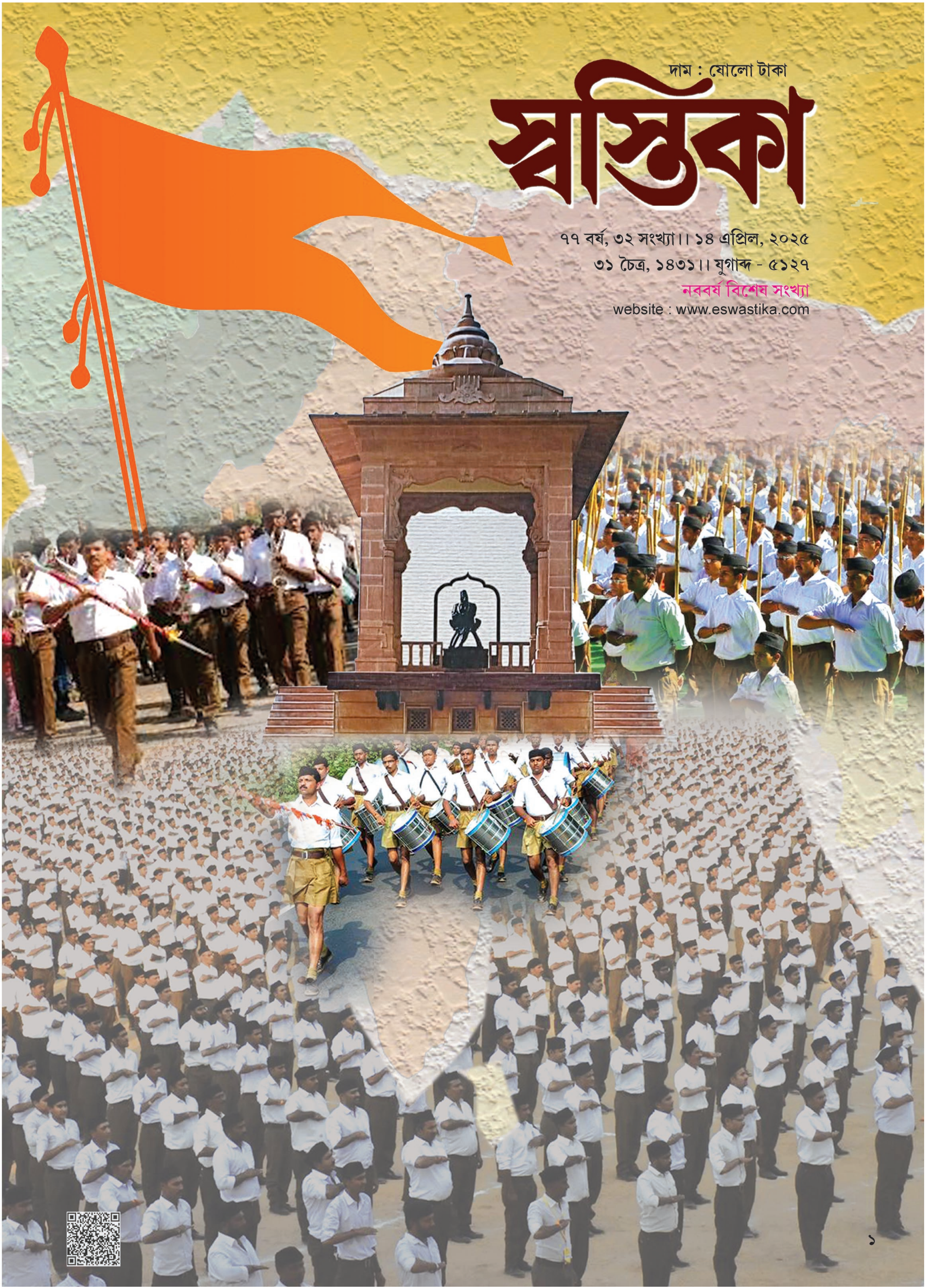

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE NEW AGE PANELS
SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা

৭৭ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ৩১ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১৪ এপ্রিল - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

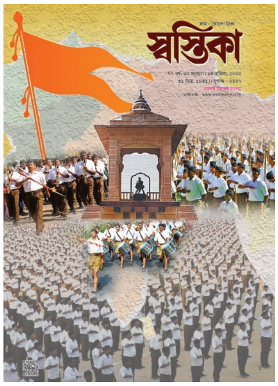

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

রাষ্ট্রচেতনার সার্বিক জাগরণই ঘটাবে ধর্মের বিজয় ও অধর্মের পরাজয় : ধর্মসংস্থাপনার্থায় ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

সঙ্ঘ বিচার-পরিবারে কিন্তু পিসি-ভাইপো নেই দিদি ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

মন্ত্র সিদ্ধ, তন্ত্র শুদ্ধ ◻ মধুভাই কুলকর্ণী ◻ ৮

শতবর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ : এক বিশ্বরূপ দর্শন ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

বঙ্গপ্রদেশের সঙ্ঘকাজের আরম্ভ ও বিস্তার ◻ সুনীলবরণ মুখোপাধ্যায় ◻ ১৪

ত্রিপুরায় সঙ্ঘকাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ◻ কানুরঞ্জন দেবনাথ ◻ ১৭

সঙ্ঘকাজের পথ কণ্টকাকীর্ণ ◻ সুনীলপদ গোস্বামী ◻ ১৯

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর পুণ্যস্মৃতি ◻ কালিদাস বসু ◻ ২৩

সঙ্ঘের শাখাই স্বয়ংসেবকদের সাধনাস্থল ◻ অমিত কুমার চৌধুরী ◻ ২৫

বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বঙ্গের স্বাধীন ও সার্বভৌম নৃপতি : মহারাজা শশাঙ্ক ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

সাক্ষাৎকার : 'সঙ্ঘের এক ও একমাত্র লক্ষ্য হলো সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা : শতবর্ষে দাঁড়িয়ে সেই লক্ষ্যপূরণের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে সঙ্ঘ' — ডাঃ মোহনরাও ভাগবত ◻ ৩৫

একটি চিন্তাধারার পূর্ণতা ◻ বলবীর পুঞ্জ ◻ ৪৩

সংকটের সেই দিনগুলি ◻ বংশীলাল সোনী ◻ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৭-২৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ বাংলা নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

— স্বস্তিকা পরিবার

ফঃ ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২১ এপ্রিল ২০২৫

প্রকাশিত হবে ২১ এপ্রিল ২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সঙ্ঘ ও বিবিধ সংগঠন

সঙ্ঘ সাধনায় স্বয়ংসেবকরা সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পা রেখেছেন। সেই ক্ষেত্রে গড়ে তুলেছেন সংগঠন। সমাজ পরিবর্তনে সেইসব বিবিধ সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি এক-একটি প্রথম সারির সংগঠন হিসেবে সমাজের এক-একটি ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

স্বস্তিকার আগামী দুটি সংখ্যায় সঙ্ঘপ্রেরণায় সৃষ্ট বিবিধ সংগঠনের পরিচিতি ও কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবেন বিবিধ ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ কার্যকর্তারা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

With Best Compliments
From-

A
Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সাধনার শতবর্ষে

ভারতের নূতন রূপ দেখিয়া চমকিত হইবারই কথা। ক্রমাগত বৈদেশিক আক্রমণে জর্জরিত হইয়া ভারত পুনর্বার মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে? এতদ্বিষয়ে প্রমুখ নেতৃবর্গ বারংবার ইহা অসম্ভব বলিয়া তাহাদিগের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি সকল সন্দেহের অবসান ঘটাইয়া সমস্ত প্রকারের অসম্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। পরাধীনতার নিদর্শন ধূলিসাৎ হইয়া স্বাভিমানের বিজয় প্রতীক নির্মিত হইয়া চলিয়াছে। একদা ম্লান হইয়া পড়া প্রাচীন পরম্পরাসকল স্বমহিমায় তথা পূর্ণমর্যাদায় পালিত হইতে শুরু হইয়াছে। জনমানসে ধারণা নির্মিত হইয়াছে যে, সমাজ জাগ্রত হইতেছে। মুখ্যত হিন্দুসমাজের শক্তি জাগ্রত হইয়া মৃগেন্দ্র গর্জনে দিগ্বিদিক মুখরিত করিতেছে। পরস্পরের মধ্যেকার ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পরিচয় ভুলিয়া হিন্দু নামে জাগ্রত হইতেছে। কিন্তু এই জাগরণের আধার কী? এই জাগরণের আধার হইল সাধনা। একক সাধনা নহে, সম্মিলিত সাধনা, রাষ্ট্রসাধনা। শতবর্ষ পূর্বে সাধনার শুভারম্ভ ঘটিয়াছে। এক রাষ্ট্রঋষি রাষ্ট্রভক্তির বীজমন্ত্র লইয়া কতিপয় বালক-কিশোরকে সঙ্গে লইয়া সেই সাধনায় রত হইয়াছিলেন। আত্মপ্রচারের অন্তরালে থাকিয়া সমাজের অভ্যন্তরে সমাজকে সঙ্গে লইয়া সেই সাধকগণ বীরব্রত ধারণ করিয়া অদ্ভুত সাধনায় মগ্ন হইয়াছেন। এক নিষ্কাম তপস্বীর ন্যায় সহযোগী সাধকগণও নিরন্তর সাধনা করিয়া চলিতেছেন। এই সাধনা আত্মসিদ্ধির জন্য নহে, রাষ্ট্রকল্যাণের নিমিত্ত। রাষ্ট্রকে পরম বৈভবসম্পন্ন করিবার দৃঢ় সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথে নিরন্তর অগ্রসর হইবার সাধনা। শতবর্ষের দীর্ঘ সাধনার যাত্রাপথে বারংবার বাধা উপস্থিত হইয়াছে। প্রতিবারই সাধকগণ নিজ অভীষ্টে অবিচল থাকিয়া সমস্ত বাধা দূরীভূত করিয়াছেন, বরং তাহার ফলস্বরূপ সাধনায় নব নব শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। সাধকগণ ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তের প্রত্যন্ত স্থানে তাহার বিস্তৃতি ঘটাইয়াছেন। তাহার ফলে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রভক্তির বিস্তার ঘটিয়াছে। জনমানসে চেতনা জাগ্রত হইয়াছে এবং সেই প্রক্রিয়া নিরন্তর চলিতেছে। ভারতের ক্ষয়িষ্ণু চিন্তা দূরীভূত হইয়া সমাজের স্বাভিমান জাগ্রত হইতেছে। প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা দৃঢ়তর হইতেছে। ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতির বিশ্বজনীন বিস্তার ঘটিতেছে। নবীন প্রজন্ম রাষ্ট্রীয় কার্যে সোৎসাহে নিযুক্ত হইতেছে। এই সমস্ত কিছুই সেই সাধনার ফল।

এই রাষ্ট্র সাধনার নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। ১৯২৫ সালে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার তাহার সূচনা করিয়াছেন। অবজ্ঞা, নিন্দা, বিরোধিতার কাল সমাপ্ত হইয়া সমাজের প্রশংসা তথা সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করিয়াছে সঙ্ঘ। সূচনাকালে কতিপয় ব্যক্তি রাষ্ট্র সাধনার এই মহতী প্রচেষ্টাকে অবজ্ঞাভরে কৌতুক করিয়াছে, নিন্দা করিয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও স্বয়ংসেবকগণ ভিন্ন প্রদেশে যাইয়া সেইখানকার ভাষা, রীতিকে আয়ত্ত করিয়া অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিয়া, কিঞ্চিন্মাত্র খাদ্যে জীবন ধারণ করিয়া নিরন্তর কার্যবিস্তার ঘটাইয়াছেন। নীরবে নিভৃতে রাষ্ট্রের পুনর্নির্মাণের সাধনায় মগ্ন থাকিয়াছেন। বিরোধিতার পর্ব পরাধীন ভারত অপেক্ষা স্বাধীন ভারতে অধিক ঘটিয়াছে। সঙ্ঘকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত করিবার অভিপ্রায়ে তৎকালীন বৈরী শাসনতন্ত্র তিন-তিনবার নিষেধাজ্ঞা আরোপিত করিয়াছে। তথাপি সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া বহুগুণে বহু ধারায় কার্যের বিস্তার ঘটিয়াছে। সঙ্ঘ কেবলমাত্র রাষ্ট্র সাধনার সাধকরূপ ব্যক্তি নির্মাণ কার্য সম্পাদন করিয়াছে। তাঁহারা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক আদর্শের প্রতি অবিচল থাকিয়া স্ব-স্ব ক্ষেত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রোত্থানের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। শতবর্ষের কালখণ্ডে সঙ্ঘ সমাজের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া গিয়াছে। শতবর্ষে উপনীত হইয়া শতবর্ষ উদ্‌যাপন লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য হইল সমাজে প্রচলিত সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাইয়া সদর্থক বিমর্শ নির্মাণ। পঞ্চ পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি তথা সমাজের মানস পরিবর্তন। সম্পূর্ণ সমাজকে সাধনক্ষেত্রে পরিণত করা। সঙ্ঘ সাধনার শতবর্ষ হইয়াছে, তথাপি সাধনা নিরন্তর চলিতে থাকিবে, কারণ এই সাধনা নিত্য সাধনা, অখণ্ড সাধনা।

সুভাষিতম্

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্তঃ ঋষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধামনম্।। (মুণ্ডকোপনিষদ)

সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের নয়। সত্যের দ্বারাই দেবতাদের যাত্রাপথ বিস্তীর্ণ হয়েছে। আপ্তকাম ঋষিগণ সেই পথেই সত্যের সেই পরম ধামে আরোহণ করতে সক্ষম হন।

রাষ্ট্রচেতনার সার্বিক জাগরণই ঘটাবে ধর্মের বিজয় ও অধর্মের পরাজয়

ধর্মসংস্থাপনার্থায়

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

তিনটি ধারার সমন্বয়েই তৈরি হয় যে কোনো জাতি। জীবন, বোধ আর সংস্কৃতির ধারা। হিন্দুজাতি সেভাবেই তৈরি হয়েছে। তা মিলে গিয়েছে হিন্দু ঐক্য আর জাগরণের কর্মধারায়। মোট ১৫টি ভাব সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সঙ্ঘের প্রার্থনা মন্ত্র। সেটাই সঙ্ঘকাজের দিক নির্দেশ। সঙ্ঘের বর্তমান প্রার্থনার গদ্যরূপ লেখেন নানাসাহেব টালাটুলে। পরে নরহরি নারায়ণ ভিড়ে তা ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃতে পদ্যরূপে অনুবাদ করেন। ১৯৪০ সাল থেকেই সেই মন্ত্র সঙ্ঘের শাখায় করা হয়। সঙ্ঘ কী আর কেন তা বুঝতে মন্ত্রটি সব কিছুর সঙ্গমস্থল। এই রাজ্যে আট দশকেরও (৮৬) বেশি সময় ধরে সঙ্ঘকাজ চলছে। ১৯৩৯ সালের বর্ষপ্রতিপদে মেছুয়াবাজার সংলগ্ন সরকার লেনের একটি বাড়ির ছাদে শুরু হয়েছিল সঙ্ঘের প্রথম শাখা। শাখা হলো সঙ্ঘের কর্ম আর মর্মস্থান। আজও তা অটল আর অমলিন।

১৯২৫ সালে নাগপুরে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার চোদ্দ বছর পর এই রাজ্যে শুরু হয় সঙ্ঘের কাজ। যাঁরা ব্রতী ছিলেন তাঁরা সকলে প্রয়াত। রেখে গিয়েছেন তাঁদের কর্মের স্মৃতি আর অভাবনীয় এক অনুপ্রেরণার ভাণ্ডার। তাঁদের রেখে যাওয়া সাংস্কৃতিক আর দার্শনিক ভাবনার নবীকরণ হয়েছে। তাকে ভিত্তি করেই রাজ্যের তিন প্রান্ত জুড়ে চলছে আনুমানিক ২৭০০ শাখার দৈনিক কাজ। প্রবীণ আর একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক ড. বিজয় আঢ্য সঙ্ঘের সেই ঐতিহাসিক বর্ণময় গতিকে তুলে ধরেছেন ‘বাংলায় সঙ্ঘকাজের ইতিহাস’-শীর্ষক এক চমকপ্রদ সংকলনে। এই আকরটি রাজ্যের সঙ্ঘ ইতিহাসে দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাষ্য। হিন্দু ঐক্যের ভিতর দিয়ে সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শের ভাবনা আর বার্তাকেই বয়ে নিয়ে চলেছেন বর্তমান সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত। সঙ্ঘ বিরোধীরা যথারীতি তার অপব্যাখ্যা করেছে। তারা নরচন্দ্রমা শ্রীরাম আর লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেরও অপব্যাখ্যা করেন।

মূর্খদের দায়িত্ববোধ থাকে না। উপনিষদের বাণী হলো বিশ্বমানব অমৃতের পুত্র। সেই বাণীকে সামনে রেখেই চলে সঙ্ঘের কাজ। প্রশ্ন উঠতেই পারে গোটা রাজ্যকে শাসক যখন দুর্নীতির চাদরে মুড়ে ফেলেছে আর হিন্দু জাতি প্রতিদিন তার হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে তখন কী হবে সঙ্ঘের কর্তব্যকর্ম? কীভাবে বা তা সম্পাদিত হবে? প্রতিটি হিন্দুর দুটি ধর্ম— জাতি ধর্ম আর কুল ধর্ম। স্বয়ংসেবকরা নিষ্ঠাভরে তাই পালন করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে (জ্ঞানযোগ) শ্রীভগবান এই দুই ধর্ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন— সাধুদের রক্ষা করা আর দুষ্টদের বিনাশ করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। তাই গীতার বাণী অনুসরণ করে বলতেই হবে যে রাজ্যের অবক্ষয়ের জন্য যারা দায়ী তাদের সমূলে বিনাশ করে ধর্মপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ভারতমাতাই সঙ্ঘের আরাধ্যা, তাই কেউ যদি তাঁর রক্তপান করতে সচেষ্ট হয় তাকে বিনাশ করতেই হবে। হিন্দুভাবেই সকলকে বাঁচতে আর বাঁচাতে হবে।

এটাই এ রাজ্যের সকল হিন্দুর প্রধানতম কর্তব্যকর্ম আর কুলধর্ম। সঙ্ঘের প্রার্থনায় বলা হয়েছে ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে বীরভাব প্রয়োজন। আর তার জন্য প্রয়োজন অধর্ম দমনের শক্তি— পরং সাধনং নাম বীরব্রতম। বীর হচ্ছেন তিনি যিনি স্বধর্মের সঙ্গে তাঁর চৈতন্যের মিলন ঘটাতে পারেন--- সমুৎকর্ষনিঃশ্রেয়সস্যৈকমুগ্রম্। তাই এই মুহূর্তে সঙ্ঘের আশু কর্তব্য হলো হিন্দুদের সেই বীরভাবকে সুসংবদ্ধভাবে জাগ্রত করে তোলা। স্বয়ংসেবক আর সঙ্ঘ অনুসরণকারী নেতৃত্বকে সবরকমের হিন্দু বিরোধিতার বিরুদ্ধে সমাজ জাগরণে ব্রতী ও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। বিজেত্রী চ নঃ সংহতা কার্যশক্তির্। ধর্ম সংরক্ষণের জন্য যত শক্তি প্রয়োজন তাই-ই সংগঠিত করতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সেই সংগ্রাম চালাতে হবে। সঙ্ঘের প্রার্থনায় সেই নির্দেশ করা হয়েছে।

বলা হয়েছে হিন্দু জাতি এক বিরাট রাষ্ট্র-পুরুষের অঙ্গ। তাই সকলকে ‘হিন্দুরাষ্ট্রাঙ্গভূতা’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক অবিভাজ্য হিন্দুরাষ্ট্রের অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। পনেরোটি ভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব হলো ধ্যেয়নিষ্ঠা। সেটাই প্রাণকেন্দ্র। তা যান্ত্রিক বাক্য নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সেই শক্তিকে যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। কোনো পশুশক্তি নয়, মূল্যবোধের ক্রোড় থেকেই তা তৈরি হবে। তবেই সকল হিন্দুজাতি হয়ে উঠতে পারে রাষ্ট্র-পুরুষের অঙ্গ। যেহেতু ভারতমাতাই সঙ্ঘের আরাধ্যা, তাই কেউ যদি তাঁর রক্তপান করতে সচেষ্ট হয় তাকে বিনাশ করতেই হবে। হিন্দুভাবেই সকলকে বাঁচতে আর বাঁচাতে হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

সঙ্ঘ বিচার-পরিবারে কিন্তু পিসি-ভাইপো নেই দিদি

লন্ডনফেরতেষু দিদি,

একশো বছর মানে সহজ অঙ্কে ৩,৬৫,০০০ দিন। কিন্তু সময়ের এই সংখ্যাটাই যথেষ্ট নয়। তবে এই সময় পর্বের ধারবাহিকতাটাই বড়ো কথা। সেই শক্তিতে ভর করেই দিদি, সঙ্ঘ একশো বছরে। আপনার প্রিয় দল কংগ্রেস বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে গিয়েছে। আর সঙ্ঘ দিনে দিনে বৃহত্তর পরিবার হয়ে উঠেছে। কারণ এই পরিবারে কোনো পিসি-ভাইপো নেই, মা-ব্যাটা বা বাপ-ব্যাটাও নেই। একই পরিবারের অনেকে থাকলেও সকলেরই একটাই পরিচয় 'স্বয়ংসেবক'। সঙ্ঘ পরিবার বলা হলেও আসলে তা একেবারেই পরিবারতান্ত্রিক নয়। পরিবারের মতো গঠন কাঠামো।

কিছু বুঝলেন দিদি? বোঝেননি তো। জানি বুঝবেন না। উলুবনে মুক্ত ছড়াচ্ছি জেনেও এত কথা বললাম। আপনার দলটা হচ্ছে স্বার্থসেবকদের ও সঙ্ঘ স্বয়ংসেবকদের। তৃণমূলে যেমন দিদি সবাই কিছু না কিছু পাওয়ার জন্য কাজ করে। সঙ্ঘে আবার সবাই কিছু না কিছু নয়, সব কিছু দেওয়ার জন্য সংগঠন করে। এখানে ডিমভাত মেলে না। শাকান্ন হলেও তার দাম দিতে হয়। কোনো কিছুই ফ্রিতে মেলে না। সেই কারণেই সঙ্ঘে একশো বছরেও নিষ্কলুষ আর আপনার সরকার মাত্র ১৪ বছরেই পাঁকে, কাদায় ল্যাজে-গোবরে।

সঙ্ঘের শতবর্ষের মধ্যে এমন একটা কথা বলতে পারবেন যা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে আঘাত করেছে? ক্ষমতার মধুর পিছনে ছুটতে গিয়ে কোনো দুর্নীতিতে জড়িয়েছে বা সমর্থন দিয়েছে? পারবেন না। আর আপনি দিদি?

সমগ্র শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে প্রহসন বানিয়ে দিয়েছেন। সঙ্ঘ জাতিকে কী শিক্ষা দিয়ে চলেছে সেটা জানলে আপনি বুঝতে পারতেন কত বড়ো অন্যায় আপনি করেছেন। এসএসসি তদন্তে যে তথ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত— যেমন, ওএমআর শিটগুলি বিনষ্ট করা হয়েছে, তার কপি রাখা হয়নি, ওএমআর শিট ফাঁকা রাখা প্রার্থীরা নিযুক্ত হয়েছেন, তালিকার বাইরে থেকে প্রার্থী নিয়োগ হয়েছে ইত্যাদি। এমন ভাবে তথ্য গোপন করার চেষ্টা হয়েছে, প্রতি স্তরে অন্যায় ঢাকার জন্য আরও বড়ো অন্যায় করা হয়েছে যে এখন ঠিক তথ্য বার করা অসম্ভব, তাই পুরো প্রক্রিয়াটিকে নতুন করে করতে বলা ছাড়া উপায় নেই। যে বিরাট সংখ্যক নিরপরাধ তরুণ-তরুণী অন্যায়ভাবে বঞ্চিত ও পীড়িত হলেন, তাঁরা ও বাকিরা মনে রাখুন, তাঁদের এই হেনস্থার দায়— সম্পূর্ণত রাজ্য প্রশাসনের। দিদি, আপনিই হিমালয়প্রমাণ দুর্নীতির কাণ্ডারি। আপনার অপরাধের দাম আজ এই অসহায় নিরাপরাধদের মাথায় বজ্রাঘাতের মতো নেমে এসেছে। এই গভীর উদ্বেগপ্রহরে আপনার কাছে একান্ত অনুরোধ, অন্য কারও উপর দোষ চাপানোর ন্যক্কারজনক প্রয়াসে নিজেদের অমানবিকতার পরিমাণ আর বাড়াবেন না। জানি আপনি করবেন না। কিন্তু সততার শিক্ষা নেওয়া অপনার জরুরি। যেটা আপনার নেই সেটা নিয়েই আপনার বড়াই। তাই কখনো সঙ্ঘ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করার আগে সততা নিয়ে পারলে একটু লেখাপড়া করে নেবেন। কিন্তু সে তো আবার আপনার ধাতে নেই।

আপনি সঙ্ঘ বর্ণিত রামরাজ্যের নিন্দা করেন তো। আপনি মনে করেন সেটা হিন্দুদের রাজ্য হয়ে যাবে। ঠিকই মনে করেন। সঙ্ঘের কল্পনায় যে ধর্মরাজ্য সেখানে চাকরি বিক্রি হয় না। সেখানে আপনার মতো পিসি-ভাইপো সর্বস্ব দল হয় না।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে একটি দুরূহ কাজ করতে হবে। এই হতাশ্বাস তরুণ-তরুণীদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহস জোগাতে হবে, পুনর্বার সামনের দিকে তাকিয়ে চলার শক্তি দিতে হবে। সেই সঙ্গে ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিল থেকে শিক্ষা নিয়ে ২০২৬ সালেই আপনাকে সরাতে হবে। নচেৎ পশ্চিমবঙ্গের মুক্তি নেই।

আপনি সঙ্ঘ বর্ণিত রামরাজ্যের নিন্দা করেন তো। আপনি মনে করেন সেটা হিন্দুদের রাজ্য হয়ে যাবে। ঠিকই মনে করেন। সঙ্ঘের কল্পনায় যে ধর্মরাজ্য সেখানে চাকরি বিক্রি হয় না। সেখানে আপনার মতো পিসি-ভাইপো সর্বস্ব দল হয় না। সঙ্ঘ সমগ্র সমাজকে নিজের বলে মনে করে। □

অতিথি কলম

মধুভাই কুলকর্ণী

মন্ত্র সিদ্ধ, তন্ত্র শুদ্ধ

অজেয় শক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ হিন্দু সমাজ উঠে দাঁড়ালেই বিশ্ব তথা মানবতার কল্যাণ সম্ভব। এই ধ্যেয় নিয়েই ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার সঙ্ঘ স্থাপনা করেন।

১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থাপনা এবং ১৯৪০ সালেই ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের পরলোকগমন। মাঝের পনেরো বছরে সঙ্ঘ কাজ দেশব্যাপী বিস্তার লাভ করে। ১৯৪০ সালের প্রশিক্ষণ বর্গে সারা দেশ থেকে ১৪০০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ৯ জুন বর্গের সমাপ্তি পর্বে তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় ডাক্তারজীর ভাষণ হয়। কার্যকর্তাদের কাছে সেটিই ডাক্তারজীর শেষ পথনির্দেশ । ডাক্তারজী হয়তো তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই সমস্ত শক্তি এক করে সেই ভাষণটি দেন।

তিনি বলেছিলেন, ''...আমার মনে হয় না আজ আমি আপনাদের সামনে দুটো শব্দও ঠিক করে বলতে পারব। সঙ্ঘের দৃষ্টিতে এই বছরটি অত্যন্ত সৌভাগ্যের। আজ আমি আমার সামনে হিন্দুরাষ্ট্রের ছোট্ট স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি। আমার ও আপনাদের পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও এমন কী বিষয় আছে যার কারণে আপনাদের অন্তঃকরণ আমার দিকে এবং আমার অন্তঃকরণ আপনাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে চলেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তত্ত্বজ্ঞান এতটাই প্রভাবশালী যে, যে স্বয়ংসেবকদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় নেই, তাদের মধ্যে একে অপরের দিকে তাকাতেই ভালোবাসার উদয় হয়। কথা বলতে বলতেই পরস্পর বন্ধু হয়ে যায়। আমি ২৪ দিন অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী ছিলাম, কিন্তু আমার মন আপনাদের কাছেই ছিল। আজ আপনারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাবেন। আমি আপনাদের আন্তরিকতার সঙ্গে বিদায় জানাচ্ছি। আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন, 'যতক্ষণ শরীরে প্রাণ আছে ততক্ষণ আমি সঙ্ঘকে ভুলব না'।''

ডাক্তারজী এরপর বলেন, ''আজ আমার দ্বারা কতটা কাজ হলো, তা প্রতিদিন শোওয়ার সময় ধ্যান করুন। সঙ্ঘের কার্যক্রম ঠিক মতো করার জন্য প্রতিদিন সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত থাকলেই সঙ্ঘকাজ শেষ হয়ে যায় না। 'আসেতু হিমালয়' বিস্তৃত হিন্দু সমাজকে আমাদের সংগঠিত করতে হবে। ...গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্ষেত্র সঙ্ঘের বাইরেই রয়েছে। সঙ্ঘ শুধুমাত্র স্বয়ংসেবকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সঙ্ঘের বাইরের মানুষদের জন্যও সঙ্ঘ। রাষ্ট্রোদ্ধারের প্রকৃত পথ নির্দেশ করা আমাদের কর্তব্য। ...হিন্দু সমাজের চরম কল্যাণ সংগঠনের মধ্যেই রয়েছে। দ্বিতীয় কোনো কাজ সঙ্ঘকে করতে হবে না।

... সঙ্ঘ আগে কী করবে? এই প্রশ্ন অর্থহীন। সঙ্ঘ সংগঠনের এই কাজ আগে আরও গতির সঙ্গে করে যাবে। অবশ্যই এই যাত্রায় এক স্বর্ণিম দিন আসবে, যখন সমগ্র ভারত সঙ্ঘময় হয়ে যাবে। এর পর হিন্দুদের দিকে বাঁকা নজরে দেখার সাহস বিশ্বের কোনো শক্তিই করবে না। ...আমরা কারও উপর আক্রমণ করার জন্য বের হইনি, কিন্তু আমাদের উপর আক্রমণ না হোক, এই সাবধানতা আমাদের রাখতেই হবে।''

ডাক্তারজী যেমন বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্ষেত্র সঙ্ঘের বাইরেই রয়েছে। সঙ্ঘ শুধুমাত্র স্বয়ংসেবকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সঙ্ঘের বাইরের মানুষদের জন্যও সঙ্ঘ। রাষ্ট্রোদ্ধারের প্রকৃত পথ নির্দেশ করা আমাদের কর্তব্য।'

সঙ্ঘের কার্যরচনাতে সেই কাজ গটনায়ক করে থাকে। ৭-৮ জন স্বয়ংসেবকের বাড়িতে সম্পর্ক করার কাজ তাদের দেওয়া হয়। তারা প্রতিটি বাড়িতে বার বার যায়। মা-বাবা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করা, সঙ্ঘ বিষয়ে বিভিন্ন খবরাখবর দেওয়া, এসব কাজ তারা সহজভাবেই করে থাকে। তারা পরিবারের বড়োদের শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানায়। বার বার যাতায়াত করার কারণে একসময় তারা পরিবারেরই একজন হয়ে যায়। মনে করুন, একজন গটনায়ক ৮টি পরিবারে যায়, প্রতিটি পরিবারে গড়ে ৫ জন সদস্য থাকলে একজন গটনায়ক প্রায় ৪০ জনের মনকে সঙ্ঘানুকূল অর্থাৎ রাষ্ট্রানুকূল করে। একটি শাখায় যদি ৫ জন গটনায়ক থাকে, তবে সেই শাখা কমপক্ষে ২০০ জনের মধ্যে চেতনাবোধ জাগ্রত করে। একেই একাত্ম মানবদর্শন প্রণেতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় 'জনমন সংস্কার' বলেছেন। গটনায়ক সম্পর্ক সোপানের প্রথম ধাপের কার্যকর্তা।

জাগ্রত বিবেক

জনমন বিভিন্নভাবে তৈরি হতেই থাকে। শিক্ষা, সাহিত্য, কলা, সংগীত, সংবাদমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম, নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দলের দ্বারা উত্থাপিত আলোচনা ইত্যাদি মাধ্যমে জনমন নির্মাণ হয়ে থাকে। বর্তমান যুগ হলো তথ্যের যুগ। বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতাদর্শ আমাদের উপর অনবরত প্রভাব ফেলে চলেছে। এমন পরিবেশে কী গ্রহণ

করা উচিত আর কোনটা ছেড়ে দেওয়া উচিত, সেই বোধ জাগ্রত রাখতে হয়। কিছু মানুষ একে বিবেকবুদ্ধিও বলে থাকেন। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য যা মঙ্গলজনক, তা স্বীকার করা উচিত। 'আমার জন্য উপকারী কিন্তু পরিবারের জন্য নয়, পরিবারের জন্য মঙ্গলজনক কিন্তু সমাজের (জাতি, সংগঠন, মত-পন্থ ইত্যাদি) জন্য অমঙ্গল, সমাজের জন্য মঙ্গলজনক কিন্তু দেশের জন্য নয় এমন বিষয়কে ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমার নিজের, পরিবারের, সমাজের ও দেশের হিতে যা হবে সেটাই গ্রহণযোগ্য', একেই বিবেকবুদ্ধি বলে। ব্যক্তি ও সমাজের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত রাখার জন্য যে সমস্ত প্রচেষ্টা চলছে তাকে 'জনমন সংস্কার' বলা যেতে পারে। এ ধরনের কাজ সাধুসন্ত, কীর্তনিয়া, প্রবচনকারী, ঋষি-মুনি, ভিক্ষুগণ করে থাকেন। যাঁদের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নেই, যাঁরা প্রশাসনিক ক্ষমতাতুর, কামাতুর, ধনাতুর, মানাতুর নন এবং রাষ্ট্রহিতকেই সর্বোপরি মনে করেন, তাঁরাই জনমন সংস্কার করতে পারেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকের সমাজে ভূমিকা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জীবনে ভূমিকা জনমন সংস্কারেরই। স্বয়ংসেবকরা গৈরিক পতাকা অর্থাৎ 'ত্যাগমূর্তি'কে সাক্ষী মেনে প্রতিজ্ঞা করে— ''আমি সঙ্ঘের কাজ সৎভাবে, নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে, দেহ, মন ও ধন দ্বারা করিব।'' স্বয়ংসেবকদের কোনো বস্তুর প্রতি মোহ সৃষ্টি হয় না। একটি কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি তার হৃদয়ে সর্বদা বাজতে থাকে—

পত্রিকায় হবে নাম লেখা, পরিবে গলে স্বাগতহার,
ছেড়ে এই ক্ষুদ্র ভাবনা, হিন্দুরাষ্ট্রের ত্রাতা হয় অগ্রসর।।

স্বয়ংসেবক যেখানেই থাকে সেখানেই অনেক আত্মীয়-পরিজন তৈরি করে ফেলে। সে কারও প্রতি ভেদাভেদ বা বৈরিতা পোষণ করে না। চরিত্রবান, নিঃস্বার্থ সেবা, স্নেহপূর্ণ বিনম্র ব্যবহারের কারণে নিজের এলাকায় সম্মানের পাত্র হয়ে থাকে। সমাজের কোনো একটি বর্গের, জাতির বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে সে কাজ করে না। যে কারও বিপদেই সে দৌড়ে যায়, এই জন্য বহু মানুষের মনে হয় এ তো এই এলাকার বা সংগঠনের ভিত্তি। মানুষজন তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে। এখান থেকেই তার জনমন সংস্কার করার কাজ শুরু হয়। ডাক্তারজীর দেওয়া শেষ ভাষণের পথনির্দেশ তার মনে থাকে— 'রাষ্ট্রোদ্ধারের প্রকৃত পথ নির্দেশ করা আমাদের কর্তব্য। ...হিন্দু সমাজের কল্যাণ সংগঠনের দ্বারাই।'

তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীবালাসাহেব দেওরস বলেন, 'আত্মীয়তাপূর্ণ পারিবারিক সম্পর্ক যদি হয় তবেই আলোচনা সহজ ও সরল হবে।' বাড়ি-বাড়ি সম্পর্ক সঙ্ঘ শাখার প্রাণ। ১০ হাজার জনবসতিতে কমপক্ষে একটি শাখা, এই গড় হিসাব আজও একই আছে অর্থাৎ একটি শাখার দ্বারা ২০০০ পরিবারে সম্পর্ক। সমাজ সঙ্ঘের এবং সঙ্ঘ সমাজের, এটাই মন্ত্র। সমাজের মন বোঝার জন্য সম্পর্ক অতি প্রয়োজন। সঙ্ঘের শাখা সম্পর্কের সুযোগ খুঁজতেই থাকে। রক্ষাবন্ধন এমনই একটি সুযোগ। বন্ধুত্ব বিস্তারের জন্য রক্ষাবন্ধনের অনুষ্ঠান অত্যন্ত উপযোগী।

সম্পর্ক ও নিয়োজন

লোক সম্পর্ক, লোক সংস্কার, লোক সংগ্রহ এবং লোক নিয়োজন —এগুলিকে আমরা ডাক্তারজীর জীবনসূত্র বলতে পারি। এই সূত্র ধরেই স্বয়ংসেবকেরা সমাজে কাজ করে চলেছেন। জনসম্পর্কের মাধ্যমে আত্মীয়তা ও সরলতা নির্মাণ হয়, এটিই জনসম্পর্কের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। লোক সংস্কার অর্থাৎ সমাজের তথা দেশের অনুকূল ভাবনাচিন্তা এবং সেই মতো ব্যবহার করা প্রয়োজন। লোক সংগ্রহ অর্থাৎ দেশহিতে চিন্তাভাবনাকারী ব্যক্তিদের আমাদের কাজে যুক্ত করা এবং লোক নিয়োজন অর্থাৎ সংগঠনের কাজে নিজেকে সমর্পিত করবে এমন কার্যকর্তা নির্মাণ। এই পর্যায় সবসময় চলতে থাকা চাই।

সঙ্ঘের প্রচেষ্টা হলো, জনসম্পর্কের পরিধি যতটা বৃদ্ধি করা যায় ততটা বাড়ানো উচিত। সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর (বৈজ্ঞানিক, খেলোয়াড়, শিল্পী, সাধুসন্ত, ধর্মাচার্য, কৃষক, শ্রমিক, জনজাতি ইত্যাদি) প্রমুখ ব্যক্তির তালিকা তৈরি করে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক করা হয়। প্রতিনিধি সভার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজীর বিজয়াদশমী উৎসবের বক্তব্য নিয়ে দেশের বেশিরভাগ শহরে বিশেষ আলোচনার আয়োজন করা হয়। ডাক্তারজী তাঁর শেষ বক্তব্যে বলেছেন, 'সঙ্ঘের দৃষ্টিতে এই বছরটি অত্যন্ত সৌভাগ্যের। আজ আমি আমার সামনে হিন্দুরাষ্ট্রের (জাগ্রত হিন্দু সমাজের) ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখতে পাচ্ছি। ...অবশ্যই এই যাত্রায় এক স্বর্ণিম দিন আসবে, যখন সমগ্র ভারত সঙ্ঘময় হয়ে যাবে। এর পর হিন্দুর দিকে বাঁকা নজরে দেখার সাহস বিশ্বের কোনো শক্তিই করবে না।' এই রকম অজেয় শক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ হিন্দু সমাজ উঠে দাঁড়ালেই বিশ্ব তথা মানবতার কল্যাণ সম্ভব। এই ধ্যেয় নিয়েই ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার সঙ্ঘ স্থাপনা করেন।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষকে উপলক্ষ্য করে আগামী ১৪, ২১ ও ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের স্বস্তিকা বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে। এই তিনটি বিশেষ সংখ্যা সঙ্ঘের তথা বিবিধ ক্ষেত্রের দেশব্যাপী কার্যকলাপ ও কার্যবৃদ্ধির তথ্যে সমৃদ্ধ হবে।

দাম একই থাকছে ১৬.০০ টাকা। সত্বর কপি বুক করুন। কমপক্ষে ১০ কপি নিলে ২৫% কমিশন দেওয়া হবে।

—ব্যবস্থা বিভাগ, স্বস্তিকা

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Ganpati Sugar Industries Limited

Head Office
20B, Abdul Hamid Street
4th Floor, Kolkata - 700 069
Phone : 033-22483203
Fax : 033-22483195

Administrative Office
8-2-438/5, Road No. 4
BANJARA HILLS
Hyderabad - 500 034
040-2335215/213

Works
Village - Fasalwadi
Mandal Sangareddy
District - Medek
Andhra Pradesh

শতবর্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এক বিশ্বরূপ দর্শন

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

তখন আশির দশক। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার পঞ্চাশ বছরের চলার পথ পূর্ণ করেছে। কিন্তু তখনও দেশে সঙ্ঘ একটি প্রায় অপরিচিত নাম। সে সময় পত্রপত্রিকায় সঙ্ঘের কোনো খবর ছাপা— এ ছিল কল্পনারও অতীত। তখন বরুণ সেনগুপ্ত বর্তমান পত্রিকার সম্পাদক। বরুণবাবুর প্রেরণায় সে পত্রিকায় লিখতেন পবিত্র কুমার ঘোষ, জয়ন্ত ঘোষাল, সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রবীর ঘোষালের মতো জাতীয়তাবাদী হিন্দুত্বপ্রেমী সাংবাদিকরা। সে বর্তমান আজকের মতো শাসকদলের পদলেহনকারী মুসলমানপন্থী হয়ে যায়নি। তখন আমার বয়স ১২/১৩ হবে। বালক বয়েস। দু'তিন বছর হলো সঙ্ঘের শাখায় যোগ দিয়েছি। মনে আছে একদিন বর্তমান পত্রিকায় পাঁচের পাতার এক কোনে সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসের একটা এক লাইনের উক্তি ছাপা ছিল। তাতেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম আমরা। তারপর সেই লেখাটি কাঁচি দিয়ে কেটে লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে বলতাম দেখো আমাদের সংগঠন কত বড়ো তার নাম পত্রিকায় বেরিয়েছে।

সে ৫০ বছর আগেকার কথা। দেশের মানুষের কাছে সঙ্ঘ ছিল অপরিচিত। কারণ সঙ্ঘ সেদিন আজকের মতো সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়নি। আর সঙ্ঘ সেদিন শাখায় শাখায় তরুণ-বালক-যুবকদের নিয়ে খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও বৌদ্ধিক বিকাশের কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল আগামী প্রজন্মকে দেশভক্ত চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে নির্মাণ করা, যারা দেশের জন্য বাঁচতে শিখবে, দেশের জন্য মরতে শিখবে। স্বামীজী বলেছিলেন— 'মানুষ চাই মানুষ আর সব হইয়া যাইবে।' সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার স্বামীজীর সেই মানুষ তৈরির স্বপ্নকে সাকার করার সংকল্প নিয়ে সঙ্ঘের শাখা শুরু করেছিলেন। শাখা মানে রাষ্ট্রভক্ত মানুষ তৈরির কঠিন সাধনা। এই মানুষ হাটে-বাজারে রেডিমেড পাওয়া যায় না। সভাসমিতি করে, ভাষণ দিয়ে, দেওয়াল লিখনে, বিজ্ঞাপনেও মেলা অসম্ভব। নিত্য প্রতিদিন কঠোর অভ্যাসের দ্বারা নির্মাণ করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, প্রতিদিন ঘটি মাজলে, তবে ঘটি চকচকে থাকবে, তা না হলে ঘটিতে কস পড়ে ঘটি কালো হয়ে যাবে। পরিষ্কার ঘটির জলই ঈশ্বরের পায়ে অর্পণ করা উচিত। সঙ্ঘও মনুষ্যরূপী ঘটিকে প্রতিদিন সংস্কাররূপী মার্জনার দ্বারা মনের উপর জমা কালিমা পরিষ্কার করে তাকে সতত উজ্জ্বল রাখার কাজ করে চলেছে। তবেই তো তা রাষ্ট্রদেবতার অঞ্জলি দেওয়ার যোগ্য হবে। এ কাজ সাধনার কাজ, এ কাজ প্রচারের দ্বারা হয় না। তাই তখন সঙ্ঘে কোনো প্রচার বিভাগ ছিল না। তার একমাত্র লক্ষ্য চরিত্রবান দেশভক্ত ব্যক্তি নির্মাণ।

> **সঠিক নেতৃত্বের হাতে দেশ না থাকলে দেশের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই সঙ্ঘ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও দেশ যাতে দেশভক্ত ও শক্তিশালী নেতৃত্বের হাতে থাকে তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে।**

স্থাপনার প্রথম ৫০ বছর অর্থাৎ ১৯২৫ থেকে ১৯৭৫ সঙ্ঘ ছিল মানুষের কাছে প্রায় অজ্ঞাত পরিচয়হীন এক সংগঠন। কিন্তু ১৯৫০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত এই ২৫ বছর সঙ্ঘের শাখায় সংস্কারিত স্বয়ংসেবকরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গিয়ে তৈরি করলেন অনেক সহযোগী সংগঠন— রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, বিদ্যার্থী পরিষদ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, বিদ্যা ভারতী, ভারতীয় জনসঙ্ঘ (অধুনা বিজেপি), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, কিষাণ সঙ্ঘ প্রভৃতি। ২৫ বছর ধরে স্বয়ংসেবকরা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের পোঁতা সেই চারা গাছগুলিকে পরিচর্যা করলেন। ২০০০ সাল আসতে আসতে সঙ্ঘের ৭৫ বছরে সেই ছোট্ট চারাগাছগুলি চারিদিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে ধীরে ধীরে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হলো। তখন দেশের মানুষ সঙ্ঘের নাম, সঙ্ঘের আদর্শ জানতে ও বুঝতে শুরু করলেন।

সঙ্ঘ হিন্দুত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পুনর্নির্মাণে বিশ্বাসী। সমাজে সঙ্ঘের গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকায় হিন্দুত্ব বিরোধী কংগ্রেস ও বামপন্থীরা স্বয়ংসেবকদের বিরুদ্ধে কুৎসা শুরু করল। সঙ্ঘ কী? তার কাজ কী? এই কথা দেশের মানুষ প্রথম স্বয়ংসেবকদের মুখ থেকে শোনেনি। শুনেছে সঙ্ঘ বিরোধীদের কাছ থেকে। কারণ স্বয়ংসেবকরা ছিল প্রচার বিমুখ। ধীরে ধীরে

ফঃ ২

স্বয়ংসেবকরা অনুভব করলেন এই কুৎসা ও অপপ্রচারের জবাব দেওয়া উচিত। দেশের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র করে যাওয়া এই বাম-কংগ্রেস নেক্সাসকে প্রতিহত করা উচিত। সে লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে শুরু হলো সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের কাজ। কিন্তু সঙ্ঘের প্রচার বিভাগ সঙ্ঘের মহিমামণ্ডন করার জন্য নয়। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ভারতের সনাতন সংস্কৃতি, সভ্যতা, ঐতিহ্য, গৌরবময় ইতিহাস প্রচার করার জন্যই শুরু হয়েছে। আজ ২০২৫, সঙ্ঘের শতবর্ষে ভারতীয় জনমানসে জমে থাকা বিভ্রান্তির কালো মেঘ সরে গিয়ে নির্মল আকাশ প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের মানুষ ধীরে ধীরে সঙ্ঘের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতির সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানতে বুঝতে শুরু করেছে। কংগ্রেস রাজনৈতিক চক্রান্ত করে সঙ্ঘকে তিন-তিন বার নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু সঙ্ঘ প্রত্যেকটি অগ্নি পরীক্ষায় শুধু নিষ্কলুষই প্রমাণিত হয়নি, বরং প্রতিবার পূর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর ভাবে স্বমহিমায় প্রকটিত হয়েছে।

সনাতন বৈদিক পরম্পরায় অন্যতম স্তম্ভ হলো চতুরাশ্রম। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনচর্যা কেমন হবে তর পথনির্দেশ হলো এই চতুরাশ্রম। সুদীর্ঘ একশো বছর ধরে সঙ্ঘের পথ চলা যেন সেই চতুরাশ্রমেরই অনুসরণ। সঙ্ঘের অগ্রগতি যদি লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে ১৯২৫ থেকে ১৯৫০— এই প্রথম ২৫ বছর ছিল তার ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ নিজেকে নির্মাণের সময়। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৫— পরবর্তী ২৫ বছর ছিল তার গার্হস্থ্যের কাল। অর্থাৎ সমাজে নতুন নতুন সংগঠনের জন্মদান ও তাকে বড়ো করার প্রয়াস। তারপর ১৯৭৫ থেকে ২০০০— এই ২৫ বছর ছিল তার বানপ্রস্থ, অর্থাৎ সেই সংগঠনগুলিকে নিজের পায়ে দাঁড় করা, সুসংহত করা, সমাজের কাজে প্রস্তুত করানোর সময় ছিল সেটি। আর ২০০০ সাল থেকে আজও পর্যন্ত— এই ২৫ বছর তার সন্ন্যাস-আশ্রম। এই সময়ে সঙ্ঘ নিজেকে সমাজ সেবার কাজে ব্যাপৃত করে নিজেকে সমাজে বিলীন করে দিতে চেয়েছে।

সঙ্ঘের জন্ম থেকে শতবর্ষ, এ যেন চতুরাশ্রমেরই এক অনন্য নিদর্শন। পার্থক্য শুধু এটুকুই, এই চার ভাগে সঙ্ঘ কখনোই তার মূল কাজ— ব্যক্তিনির্মাণের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসেনি। স্বামীজী বলেছিলেন ১০০ একশো যুবক পেলে তিনি দেশকে পালটে দিতে পারেন, সে যুবকরা হবে উন্নত চরিত্র, শৃঙ্খলা পরায়ণ, সংস্কারযুক্ত, বুদ্ধিমান ও তেজস্বী। সঙ্ঘ আজও স্বামীজীর চাওয়া 'শত যুবক' নির্মাণের কাজে সতত নিয়োজিত।

সঙ্ঘ কোনো মাস অর্গানাইজেশন নয়, সঙ্ঘ ক্লাস অর্গানাইজেশন। সঙ্ঘ ভিড় নয়, ভিড়কে সঠিক দিকে পরিচালিত করতে পারে এরকম কার্যকর্তা তৈরির প্রতিষ্ঠান। ট্রেনের একটি ইঞ্জিন ৫০টি বগিকে অবলীলায় টেনে নিয়ে যেতে পারে। ইঞ্জিন আছে বলেই বগি সক্রিয়। ইঞ্জিন না থাকলে ৫০টি বগি স্থবির, মূল্যহীন। ১০০ বছর ধরে তেমনি সমগ্র সমাজকে টেনে নিয়ে চলেছে এরকম ইঞ্জিন হলো সঙ্ঘ, অর্থাৎ দক্ষ কার্যকর্তা তৈরি করার কাজ করে চলেছে।

আজ শতবর্ষের দোরগোড়ায় এসে সঙ্ঘের সেই সাধনা অনেকাংশেই সফল। সঙ্ঘের সংস্কারিত স্বয়ংসেবকরাই আজ সমাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা শিল্প ক্ষেত্রে পেয়েছি দেশের সবচেয়ে বড়ো শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা দত্তোপন্থ ঠেংড়ীকে, শিক্ষাক্ষেত্রে পেয়েছি এদেশের অগ্রগণ্য শিক্ষাসংগঠন বিদ্যা ভারতীর ভাউরাও দেওরসকে, পেয়েছি এদেশের অগ্রগণ্য জনজাতি উপজাতি সংগঠন (এসসি, এসটি, ওবিসি) বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বাবাসাহেব দেশপাণ্ডেকে, পেয়েছি দেশের সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন অখিল পরিষদের স্থপতিকার বসন্তরাও কেলকরকে, আবার কখনো পেয়েছি এদেশে রাষ্ট্রবাদী রাজনীতির রূপকার পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী, এল কে আদবানি থেকে শুরু করে বর্তমান প্রজন্মের নরেন্দ্র মোদীর মতো রাজনেতাকে। এঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সকলেই তলোয়ারের ন্যায় তীক্ষ্ণ, সূর্যের মতো প্রখর ও নিপুণ সংগঠক। এঁদের সকলেরই কারিগর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতার লক্ষ্য ছিল সর্বক্ষেত্রে সমাজের দিশা পরিবর্তন করতে পারে, দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে এরকম চরিত্রবান ব্যক্তি নির্মাণ। সঙ্ঘ সে কাজে সফল। ১৯২৫ থেকে পাঁচটি প্রজন্ম পার হয়ে গেছে— ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজী, দেওরসজী, রাজেন্দ্র সিংহ, সুদর্শনজীর নেতৃত্বে পার হয়ে বর্তমানে সঙ্ঘের নেতৃত্ব সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতজীর হাতে এসে পড়েছে। কালে কালে এদেশে অনেক সংগঠন জন্ম নিয়েছে। কিন্তু তারা যুগের সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তিত না করার কারণে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। বিপরীতে শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসেও সঙ্ঘ ক্রমবর্ধমান। তার কারণ ১০০ বছরে সঙ্ঘ তার আদর্শকে স্থির রেখে প্রতিনিয়ত তার কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে চলেছে। একসময়ের গণবেশ--- হাফি হাফপ্যান্ট, আজ ফুল প্যান্টে পরিবর্তিত। তরবারি, ছুরিকা, ভল্ল, বেত্রচর্মের খেলা আজ নিযুদ্ধ, দণ্ড, যষ্টিযুদ্ধে পরিবর্তিত। সময়ের আহ্বানে নিত্য শাখার সঙ্গে সঙ্গে মিলন, মণ্ডলী যুক্ত হয়েছে। সংগঠনকে সর্বব্যাপী সর্বস্পর্শী করে সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে ছটি গতিবিধি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ৫০টি সহযোগী সংগঠন গড়ে উঠেছে। কিন্তু যে তিনটি সিদ্ধান্তের উপর সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এই তিনটি সিদ্ধান্তই হলো সঙ্ঘ সৌধের ভিত্তি। এক, ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র। দুই, হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব, আর তিন, সঙ্ঘের শাখার মাধ্যমে দেশভক্ত ব্যক্তি নির্মাণ, তাদের দ্বারাই নির্মাণ হবে পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র। সঙ্ঘের এই তিনটি সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। সঙ্ঘ ক্ষণিকের জন্যও তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। আগে গ্রামে একজন করে চৌকিদার থাকত। তার কাজ ছিল রাতে ঘুরে ঘুরে গ্রামবাসীকে সজাগ রাখা— 'জেগে থাকো' বলে ডাক দেওয়া। ১০০ বছর ধরে সঙ্ঘ হিন্দু জাতির চেতনা জাগ্রত এবং তাকে সংগঠিত করার

কাজই করে চলেছে।

কবি অতুলপ্রসাদ তার গানে স্বপ্ন দেখেছিলেন, 'ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'— সঙ্ঘ এই একই স্বপ্ন দেখে। তবে এ স্বপ্ন সঙ্ঘ প্রথম দেখেনি, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে একই স্বপ্ন দেখেছিলেন। তখন দেশে ইংরেজ শাসন। সন্ন্যাসী ভবানন্দ জমিদার মহেন্দ্রকে পরপর তিনটি দেবীপ্রতিমার দর্শন করিয়েছিলেন। প্রথমটি ছিল আলো-আঁধারি গুহায় অনিন্দ্যসুন্দর এক দেবীপ্রতিমা, যিনি বহুবিধ অলংকারে ভূষিতা, রাজকীয় বস্ত্রে সজ্জিতা। ভবানন্দ বললেন— দেখ, ইনি হলেন 'মা যা ছিলেন', আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ আগে এরূপ ঐশ্বর্যময়ী ছিলেন। তারপর অন্য এক অন্ধকার গুহায় দেখালেন আর এক মাতৃমূর্তি— শতছিন্ন বস্ত্র, ধূলিমলিন বেশ, অলংকারহীন চিরভিখারিণীর সাজ। ভবানন্দ বললেন— ইনি হলেন 'মা যা হইয়াছেন'। অর্থাৎ হাজার বছরের পরাধীনতাকালে মায়ের এই দুর্গতি। তারপর অন্তিমে মহেন্দ্রকে বনের অন্য একটি প্রান্তে নিয়ে গিয়ে দেখালেন আরেক অনিন্দ্য সুন্দর মাতৃপ্রতিমা— যিনি সুদৃশ্য রত্নখচিত বস্ত্র ও নানা বিধ মূল্যবান অলংকারে সুসজ্জিতা, যার উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় চৌদিক আলোকিত, হাসিমুখে ভরাভয় দান করছেন। ভবানন্দ বললেন— ইনি হলেন 'মা যা হইবেন', অর্থাৎ দেশমাতৃকার ভবিষ্যৎ রূপ। যিনি হবেন অতীতের চেয়েও ঐশ্বর্যময়ী, পূর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত। স্বয়ংসেবকরা জন্মভূমি ভারতমাতাকে আনন্দমঠের 'মা যা হইবেন'— এই রূপে দেখতে চায়।

সঙ্ঘ আজ দেশের কেন্দ্রবিন্দুতে। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-তারকা যেমন প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করে চলেছে, ঠিক তেমনই সঙ্ঘকে কেন্দ্র করে আজ আবর্তিত হয়ে চলেছে এদেশের সমাজ ও রাজনীতি। সঙ্ঘই আজ এদেশের ভাগ্য নিয়ন্তা। আজ এদেশে এমন কোনো প্রিন্ট মিডিয়া নেই যারা প্রতিদিন তাদের খবরে সঙ্ঘকে নিয়ে দু'দশ পঙ্ক্তি লেখেনি। এদেশে এমন কোনো নিউজ চ্যানেল নেই যারা তাদের প্রতিদিনের নিউজ প্লটে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে নিয়ে কোনো এপিসোড দেখায়নি। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় তো আজ হিন্দুত্বের জয়জয়কার। এর কারণ কী? কারণ শত বছরে কঠোর সাধনায় সঙ্ঘ আজ দেশের এক প্রতিষ্ঠিত শক্তি। যদিও একশ্রেণীর মিডিয়া সঙ্ঘকে ভুল ভাবে উপস্থাপিত করে, তবু তাকে অগ্রাহ্য করার শক্তি আজ কারও নেই। সে মণিপুরের ঘটনা হোক, কাশ্মীর সমস্যা হোক, মাওবাদী সমস্যা হোক বা হোক মথুরা-সম্ভলের বিবাদ— সবেতেই সঙ্ঘের মতামত জানতে চায়।

সঙ্ঘ আজ এদেশের কেন্দ্রীয় শক্তি। সঙ্ঘ রাজনীতি করে না ঠিকই, কিন্তু তার কার্যকর্তা-স্বয়ংসেবকরা রাজনীতি সচেতন। সঙ্ঘ-প্রেরণায় গড়ে ওঠা ব্যক্তিরা আজ দেশের কর্ণধার। সঙ্ঘ এই দেশকে সব দিক থেকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে চায়, সে সামাজিক ক্ষেত্রে হোক, ধর্মীয় ক্ষেত্রে হোক, শিক্ষা ক্ষেত্রে হোক, শিল্পক্ষেত্রে হোক বা হোক রাজনীতির ক্ষেত্রে। আর রাজনীতি তো এদেশের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। সঠিক নেতৃত্বের হাতে দেশ না থাকলে দেশের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই সঙ্ঘ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও দেশ যাতে দেশভক্ত ও শক্তিশালী নেতৃত্বের হাতে থাকে তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে।

এক বামপন্থী বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন সারাদেশে আজ বিজেপির শাসন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংগঠন কোথায়? তাকে বললাম দেখো, এ দেশে সঙ্ঘ আর কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম একই সময়ে, ১৯২৫ সালে। তোমরা রাজনীতির মাধ্যমে এদেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু করেছিলে, আর সঙ্ঘ ব্যক্তি নির্মাণের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু ১০০ বছরে বিচার করে দেখ আজ তোমরা কোথায়, আর সঙ্ঘ কোথায়? এই পশ্চিমবঙ্গে তোমাদের এক মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতার দম্ভে একদা বলেছিলেন, 'দু-চার পিস আরএসএস, ডান্ডা মেরে মাথা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবো।' সেই তোমরা আজ কোথায়? ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। প্রায় ৬৫ জন সাংসদ নিয়ে সংসদ আলো করে বসা একসময়ের দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল বামপন্থীরা আজ ঠাঁই নিয়েছে লোকসভার এক কোণে। আর একদা কংগ্রেস, বামপন্থীদের করুণার পাত্র হয়ে থাকা, অন্যদিকে ২ সাংসদের দল বিজেপি আজ ক্ষমতায় বিরাজমান। দেশের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রায় কুড়িটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বহু রাজ্যপাল— সকলেই সঙ্ঘের সংস্কারিত স্বয়ংসেবক। তাঁরাই আজ দেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

এরপরও যদি প্রশ্ন জাগে যে সঙ্ঘ কোথায়, তাকে দেখা যাচ্ছে না কেন? তবে বলতে হয়, আজকের সঙ্ঘ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের মতো এক বিশাল, অপার, উজ্জ্বল মহিমাময় এক সত্তা। সঙ্ঘ মানে আজ কেবল মাঠে খেলাধুলা, যোগব্যায়াম করা ছোটোদের সংগঠন নয়। সঙ্ঘ আজ ৪০টিরও বেশি সহযোগী সংগঠনের সমাহার— এক বিশাল বটবৃক্ষ। এক বৃহৎ পরিবার। সেই পরিবারে আছে তার নিজের এক লক্ষ ত্রিশ হাজার শাখা-মিলন-মণ্ডলী, আছে প্রায় দেড় কোটি নিষ্ঠাবান স্বয়ংসেবক, ঠিক তেমনি আছে নারী সংগঠন— রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ৮ হাজার শাখা। আছে এবিভিপি-র ৫০ লক্ষ সদস্য, আছে বিদ্যা ভারতীর ৩০ হাজার বিদ্যালয়, ৫০ লক্ষ বিদ্যার্থী, ১০ লক্ষ আচার্য- আচার্যা। আছে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের এক কোটিরও বেশি সদস্য। আছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরংদল, দুর্গাবাহিনীর এক কোটি কার্যকর্তা, আছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের এক লক্ষ সেবা প্রকল্পের কর্ণধাররা, আছে ১৫ কোটি সদস্যের বিশাল বিজেপি, আছে আরও অনেক সংগঠন ও তার সদস্য সমর্থকরা। তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ মানে আজ কেবল খেলাধুলা নয়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ মানে কোটি কোটি হিন্দুর মহাসঙ্গম। আজ সমাজ ও সঙ্ঘ একাকার হতে চলেছে এটাই আজকের সঙ্ঘের বিশ্বরূপ। এই সঙ্ঘ অজেয়। যতদিন ধরাতলে হিন্দু, হিন্দুধর্ম, হিন্দুত্ব বেঁচে থাকবে ততদিন সঙ্ঘের আদর্শও অমর, অমলিন থাকবে।

ডা: কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

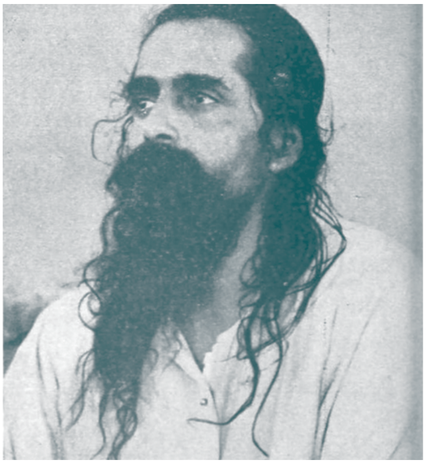

এম এস গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী)

বালাসাহেব দেওরস

বঙ্গপ্রদেশের সঙ্ঘকাজের আরম্ভ ও বিস্তার

সুনীলবরণ মুখোপাধ্যায়

আজ ভাবতেও অবাক লাগে যে অবিভক্ত বঙ্গের রাজধানী কলকাতায় সর্বপ্রথম সঙ্ঘশাখা শুরু হয় ১৯৩৯ সালে শ্রীগুরুজীর উপস্থিতিতে, সরকার লেনের হিন্দু মহাসভার অফিসের মধ্যে। সেবার (১৯৩৯) শ্রীগুরুজীর চেষ্টায় ৮ জন স্বয়ংসেবক কলকাতা থেকে সেই প্রথম নাগপুরে ওটিসি করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কয়েকজন ফিরে আসেন কলকাতায়। ডাঃ হেডগেওয়ারের সামনে ৬ জন স্বয়ংসেবকের 'প্রতিজ্ঞা' হয়েছিল আমহার্স্ট স্ট্রিট ও কেশবসেন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ঘরে (বর্তমানে অবলুপ্ত) এদের মধ্যে ছিলেন শুশ্রুত মুখার্জি (তদানীন্তন কার্যবাহ ডাঃ সন্তোষ মুখার্জির ছেলে) ও দেবদাস চ্যাটার্জি। সেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংসেবকদের মধ্যে জয়দেব ঢোলে (ঘোষ) ও বঙ্কিম ঘোষালের নাম উল্লেখযোগ্য। ডাক্তারজী কলকাতায় আসেন বীর সাভারকারের হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে যোগদানের জন্য। কলকাতা আগমন উপলক্ষ্যে ডাক্তারজী এই সময়েই মানিকতলা শাখায় (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের ঘেরা মাঠে) কয়েকজন সহর্কর্মীসহ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীবালাসাহেব দেওরস ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৪০ সালের ওটিসি পূর্ব পর্যন্ত কলকাতা তথা বঙ্গের কাজ দেখাশোনা করতেন। তাঁর সঙ্গেই ১৯৪০ সালে ওটিসি দ্বিতীয় ব্যাচ কলকাতা থেকে নাগপুরে যায়। এই ব্যাচের মধ্যে বর্তমানে প্রদেশের প্রান্ত সঙ্ঘচালক কালিদাস বসু, জ্ঞানেশ সান্যাল (গোরাদা) ও বঙ্কিম ঘোষাল ছিলেন। ১৯৪০ সালের নাগপুর ওটিসি-তে শেষদিনে গোরাদা বঙ্গপ্রদেশের 'প্রতিনিধিত্ব করেন, বাংলাভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। গোরাদা কয়েকবছর আগেই স্বর্গগত হয়েছেন। তার কিছুদিন আগে তাঁর উপর কলকাতা মহানগরের সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কলকাতার সঙ্ঘশাখা সরকার লেনের ছাদ থেকে নেমে আসে বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের বিপ্লবী পুলিনবাবুর মাঠে, সেখান থেকে বাদুড়বাগান পার্কে এবং পরে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের একটি ঘেরা মাঠে। সেখানে এখন বিদ্যমান জিতেন্দ্র নারায়ণ রায় ইনফ্যান্ট ও নার্সারি স্কুল। এখানেই বঙ্গের প্রথম প্রাদেশিক প্রচারক শ্রীবালাসাহেব দেওরসের তত্ত্বাবধানে সর্বপ্রথম মূল শাখার ধ্বজ লাগানো এবং সঙ্ঘের প্রথম প্রার্থনা (মরাঠি ও হিন্দি) আরম্ভ হয়। অকস্মাৎ একদিন এই ঘেরা মাঠে প্রবেশ করা বন্ধ হয়ে যায়।

অদ্ভুত ধৈর্য সহকারে বালাসাহেব চেষ্টা করেন যাতে বন্ধ দরজা খুলে যায়। কিন্তু সফলতা এল না। শান্ত, স্থির ও দৃঢ়তার সঙ্গে বালাসাহেব কয়েকহাত জমি পরিষ্কার করে মানিকতলা তেলকলের মাঠে সঙ্ঘশাখার কাজ চালিয়ে যান। এই তেলকলের মধ্যে সঙ্ঘস্থানে শ্রীবালাসাহেব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে আমন্ত্রণ করে এনে স্বয়ংসেবকদের 'গার্ড অফ অনার' দেন। শ্রীবিঠ্ঠলরাও পাত্কী নাগপুর থেকে প্রথমে শ্রীগুরুজীর সঙ্গে (১৯৩৯) প্রথমে কলকাতায় আসেন কিছুদিনের জন্য এবং পরে ফিরে যান। শ্রীবালাসাহেব যখন ১৯৪০ সালে ওটিসি-র সময় নাগপুর যান তারপর দ্বিতীয় প্রাদেশিক প্রচারক শ্রীবিঠ্ঠলরাও আবার কলকাতায় ফিরে আসেন এবং বঙ্গপ্রদেশের সঙ্ঘকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীদত্তাত্রেয় শ্রীধর গোরে (যবতমাল) কলকাতা নগরের প্রচারক ছিলেন। শ্রীবালাসাহেবজীর কলকাতা থাকাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে শ্রী আন্না কেদার এবং প্রভাকর তামসকর নামের দুজন কলেজ ছাত্র (মহারাষ্ট্রের স্বয়ংসেবক) খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাভাষা শিখে নিয়েছিলেন এবং কলকাতার সঙ্ঘশাখাতে কলেজ ছাত্রদের নিয়ে আসার ব্যাপারে তাদের অবদান ছিল অপরিসীম। এসময়ে প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে ডাঃ সন্তোষ কুমার মুখার্জি ও বাবু পদ্মরাজ জৈন ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলকাতা সঙ্ঘের প্রথম নিবাস ছিল ২৫ নং আমহার্স্ট স্ট্রিট, তিনতলায়। আমহার্স্ট স্ট্রিট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে। সেখানেই শ্রীবালাসাহেব

দেওরস অন্যান্য প্রচারকদের সঙ্গে থাকতেন। বঙ্গপ্রদেশের দ্বিতীয় প্রান্ত প্রচারক শ্রীবিঠ্ঠলরাওয়ের কার্যকাল ছিল ১৯৪০-৪৬। সেই সময় কার্যালয় উঠে আসে ২৬নং বিধান সরণি, তিনতলা। (মুখ্য শাখা) শ্যামনগর, গোয়াবাগান, দর্জিপাড়া, জানবাজার, বড়বাজার, ভবানীপুর ইত্যাদি। গঙ্গার পশ্চিমপাড় শিবপুরেও শাখা আরম্ভ হয়। কলকাতার বাইরে প্রদেশের শাখা বলতে সলপ, গাইবান্দা, ময়মনসিংহ সুসং, নবদ্বীপ, বহরমপুর, মালদা, খড়্গপুর, শ্রীরামপুর, রানাঘাট, কাঁচড়াপাড়া, ব্যারাকপুর, বর্ধমান, সিউড়ী, শিলিগুড়ি, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ের প্রচারক ও কার্যকর্তাদের মধ্যে

পশ্চিম পঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ থেকে বাস্তুহারা ও সর্বহারা হয়ে পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থানে চলে আসতে লাগলেন। গান্ধীজীর মুসলমান তোষণ নীতির প্রতিক্রিয়া 'একমাত্র সঙ্ঘই হিন্দুদের রক্ষা করতে পারে'--- এই ধারণা মনে রেখে অনেক বর্ষীয়ান হিন্দুও কলকাতা এবং এরাজ্যের অন্যান্য জেলায় দলে দলে শাখায় যোগদান করতে লাগলেন। ঠিক এইসময় নাথুরাম গোডসে গান্ধীজীকে হত্যা করল এবং তার সমস্ত দোষ সঙ্ঘের উপর পড়ল। ফলস্বরূপ সঙ্ঘকে অন্যায়ভাগে ১৯৪৮ সালে বেআইনি ঘোষণা করা হলো। পূজনীয় শ্রীগুরুজীকে গ্রেপ্তার করা হলো। সারা দেশে সঙ্ঘের প্রচারক ও কার্যকর্তাদের

ছিলেন প্রধান স্থপতি। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় তিনি জেলে ভীষণ অসুস্থ হন এবং মুক্তিলাভ করার পরেই তাঁর জীবনাবসান হয়। নাগপুরে ডাক্তারজীর স্মৃতিমন্দিরের সামনেই 'পাণ্ডুরঙ্গ ভবন' তাঁর স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘকার্য আরম্ভের প্রথম উদ্দীপনা শ্রীগুরুজী ও শ্রীবালাসাহেবজীর কাছ থেকে এসেছিল—এটা আগেই বলা হয়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমে এই প্রদেশে সঙ্ঘের গুরুদায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল তাঁরা হলেন—

প্রান্ত সঙ্ঘচালক---অধ্যাপক কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সঙ্ঘচালক (১৯৬৯-৭৯), অধ্যাপক অমল

বিঠ্ঠলরাও পাতকি

মনোহররাও হরকরে

দত্তোপন্ত ঠেংড়ী

দত্তোপন্ত ঠেংড়ী (হাওড়া), দত্তাত্রেয় (ময়মনসিংহ), কালিদাস সালোটকর (বহরমপুর), কালিদাস বসু (নবদ্বীপ), মুরলীধর নাইক (মালদা), রামপ্রসাদ দাস, (২৪ পরগনা ও হুগলী), সুকুমার ব্যানার্জি (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মাধব বনহাট্টি (বাঁকুড়া), ভাউ (বড়বাজার), নাগেশ সেজওয়ালকর (বর্ধমান) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীবিঠ্ঠলরাও নাগপুরে ফিরে যাওয়ার পর তৃতীয় প্রান্ত প্রচারক হয়ে আসেন নাগপুরেই শ্রী মনোহর রাও হরকরে। উনি বঙ্গপ্রদেশে ছিলেন ১৯৪৬-৫০। এই সময় দেশ স্বাধীন তথা দ্বিধাবিভক্ত হলো। অগণিত হিন্দু পূর্ববঙ্গ,

ধরপাকড়ও চলতে লাগল। এরাজ্যও বাদ গেল না। প্রতিবন্ধের সময়ও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরস্পর মেলামেশা অব্যাহত ছিল। তবুও ১৯৪৯-এর মাঝামাঝি যখন সঙ্ঘের উপর বাধানিষেধ উঠে গেল, আমরা অনুভব করলাম পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশে কাজের দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে গেছি। ১৯৪৮-৪৯ নিষেধাজ্ঞার সময়ে দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী জেলের বাইরেই ছিলেন এবং এরাজ্যের কাজের দেখাশোনা করা ও যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর উপরই ছিল। হাওড়ার শিবপুরে সঙ্ঘকাজের দায়িত্ব আগে থেকেই শ্রী পাণ্ডুরঙ্গ ক্ষীরসাগরজীর উপর ছিল। হাওড়া নগরের কাজের তিনিই

কুমার বসু ১৯৭৯-৮৪, কালিদাস বসু, অ্যাডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট। প্রথমে সহ প্রান্ত সঙ্ঘচালক ১৯৮৪-৮৯ ও পরে তিনিই তৃতীয় প্রান্ত সঙ্ঘচালক।

প্রান্ত কার্যবাহ—প্রথম প্রান্ত কার্যবাহ অমল কুমার বসু ১৯৬৩-৭৭, কালিদাস বসু ১৯৭৭-৮৪, সুনীলবরণ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৪—

প্রান্ত প্রচারক—প্রথম প্রান্ত প্রচারক ১৯৩৯-৪০, বিঠ্ঠলরাও পাত্‌কী ১৯৪০-৪৬, মনোহর হরকরে ১৯৪৬-৫০, (প্রতিবন্ধ সহ)। অমল কুমার বসু ১৯৪৯ সালে প্রথম কয়েক মাস দক্ষিণ কলকাতার প্রচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন পরে প্রান্ত প্রচারক ১৯৫০-৭৭), অমলকুমার বসু (২য়

বার) পরে প্রান্ত প্রচারক হলেন ১৯৭৭-৭৯। শ্রী কেশবরাও দীক্ষিত সহপ্রান্ত প্রচারক ১৯৭৭-৭৯, প্রান্ত প্রচারক ১৯৭৯-৯১, শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ সহপ্রান্ত ও প্রচারক ১৯৮১-'৯১, সুনীলপদ গোস্বামী ১৯৯১ প্রান্ত প্রচারক।

পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্র প্রচারক—একনাথ রাণাডে ১৯৪৯-৫৩, পরে অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ, সরকার্যবাহ, ১৯৬২ বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল। ভাউরাও দেওরস পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্র প্রচারক-১৯৬৫-৭৫, রজ্জু ভাইয়া ১৯৭৫-৭৭, কেএস সুদর্শন ১৯৭৭-৮১। বাবুরাও পালধিকর ১৯৮২...। কিছুদিন শ্রীমধুসূদন

কালিদাস বসু

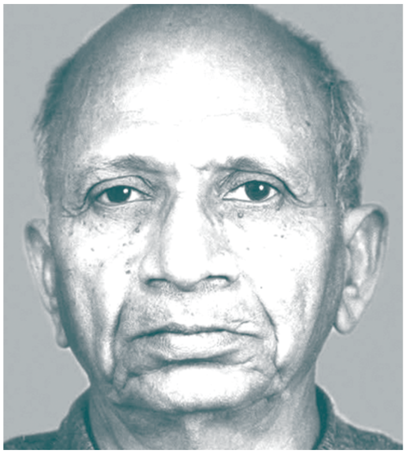

মাধব বনহাট্টি

সুকুমার ব্যানার্জি

দেও ছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ ১৯৯১...। সঙ্ঘের উপর দ্বিতীয় আঘাত আসে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময়ে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সঙ্ঘকে বেআইনি ঘোষণা করলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ সেদিন দেশব্যাপী যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সত্যাগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ছিল তার পুরোভাগে। প্রবল জনমতের চাপে, সেবারের লোকসভার নির্বাচনে সেই প্রথম কংগ্রেস দল কেন্দ্রের শাসন ব্যবস্থা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। সঙ্ঘ দ্বিতীয়বার সরকারি বাধা ও বিরোধের কষ্টিপাথরে সঙ্ঘশক্তিকে যাচাই করে এবং সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়।

এরপর আরও ১৫টি বছর পার হয়ে গেছে। সংগঠনের স্বাভাবিক নিয়মে এবং প্রচারক, কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদের নিরলস প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের শাখার সংখ্যা এখন প্রায় ১০০০। গত কয়েকবছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘ কাজের অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি সীমান্তবর্তী জেলাগুলি ছাড়াও বর্ধমান, বীরভূম জেলাতেও শাখার সংখ্যা ১২৫ থেকে ১৫০ মধ্যে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সারা প্রদেশে একটি মাত্র সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের আয়োজন করতে হতো। এখন প্রথম বর্ষের জন্য উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের আলাদা আয়োজন করতে হয়। এছাড়া দ্বিতীয় বর্ষের বর্গতো আছেই। প্রদেশে প্রচারকের সংখ্যাও বাড়ছে। পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সম্প্রতি একশো জনের বেশি স্বয়ংসেবক প্রচারক রূপে সঙ্ঘের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রচারকের সংখ্যা ২২৫। সম্প্রতি সুনীলপদ গোস্বামী নবীন প্রাদেশিক প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে। প্রাদেশিক কার্যকরী মণ্ডলের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৪। 'সঙ্ঘ সমাচার' ও 'জাগরণ' নামে দুটি পত্রিকা সঙ্ঘের প্রকাশন বিভাগ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের পরিশ্রমে ও অর্থে ১৯৮৯ সালে সঙ্ঘের নতুন প্রাদেশিক কার্যালয় 'কেশব ভবন'-এর উদ্বোধন হয়েছে। এই উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘের কাজের বিস্তারের জন্য অন্য প্রদেশ থেকে যাঁরা প্রচারক এসেছিলেন তাঁদেরও আমন্ত্রণ জানিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর জন্মশতাব্দীর কার্যক্রম উপলক্ষ্যে সারা প্রদেশে প্রায় ১০,০০০ গ্রামে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। ইতিমধ্যেই বহু গ্রামে 'সঙ্ঘমণ্ডলী' গঠিত হয়। তাছাড়া সঙ্ঘের প্রচার অভিযান, ষাট বছর পূর্তি প্রভৃতি কার্যক্রম স্বয়ংসেবকরা উৎসাহের সঙ্গে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। একাত্মতা যজ্ঞ, রামশিলা পূজা, করসেবা প্রভৃতি হিন্দু জাগরণের নানা কাজে স্বয়ংসেবকরা প্রথম সারিতে থেকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণে সাহায্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের ইতিহাসে এই প্রথম প্রান্ত প্রচারক তথা তদূর্ধ্বদের বার্ষিক দীপাবলী বৈঠক (১৯৯১) কলকাতায় হলো। বৈঠক উপলক্ষ্যে স্বয়ংসেবকদের একটি সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এরকম সম্মেলন এর আগে কখনও এরাজ্যে হয়নি। কল্যাণী শিবিরও এরাজ্যের স্বয়ংসেবকদের (২৩-২৬ জানু. ৯২) কাছে একটি ঐতিহাসিক কার্যক্রম। এর আগে ব্যাঙ্গালোর ও পুণায় এইরকম বিশাল শিবির হয়েছিল। এরাজ্যের সত্তরের দশকে এইরকম বিশাল শিবিরের প্রচেষ্টা একবার হয়েছিল। কিন্তু একাত্তরের যুদ্ধের জন্য তা স্থগিত রাখতে হয়। ১৯৯২-এর এই প্রাদেশিক শীত শিবির পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের কাছে এক প্রেরণাদায়ী স্মৃতি হয়ে থাকবে।

(লেখক প্রয়াত প্রান্ত কার্যবাহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ)

ত্রিপুরায় সঙ্ঘকাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কানু রঞ্জন দেবনাথ

ত্রিপুরা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য। ভারতের সেভেন সিস্টার্সের এক সিস্টার কিংবা বলা যায় ভারতের 'অষ্টলক্ষ্মী'র এক লক্ষ্মী আমাদের এই ত্রিপুরা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ত্রিপুরা প্রান্তের ইতিহাস বহু পুরানো। ১৯৫০ সালে ত্রিপুরাতে সঙ্ঘের শাখা শুরু হয়। সঙ্ঘের কথা বলতে গেলে ত্রিপুরার সবচেয়ে প্রবীণ একনিষ্ঠ, নিষ্ঠাবান স্বয়ংসেবক পীযূষকান্তি ভট্টাচার্যের নাম বলতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের পুরানো ও নিষ্ঠাবান স্বয়ংসেবকদের মধ্যে তিনিই বর্তমানে জীবিত। এখন তাঁর বয়স প্রায় ৮০ বছর। তাঁর কাছ থেকেই আমরা ত্রিপুরার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মোটামুটি একটা ইতিবৃত্ত জানতে পারি। তাঁর লেখা 'আমার স্মৃতিতে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' ত্রিপুরার স্বয়ংসেবকদের কাছে একটি আকর গ্রন্থ।

বর্তমানে ত্রিপুরাতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট শাখা ৩১৫টি এবং আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত এটি বেড়ে ৩৭৯টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সাপ্তাহিক মিলন মোট ১৪৭টি এবং আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৯২ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। শাখাযুক্ত খণ্ড ৫২টি এবং আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত হবে ৫৯টি। শাখা যুক্ত খণ্ড কেন্দ্র আছে সারা ত্রিপুরাতে ৪০টি এবং আগামী অক্টোবর মাস নাগাদ ৫৪টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯২৫ সালে নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হলেও ত্রিপুরা রাজ্যে সঙ্ঘকাজ শুরু হয় ১৯৫০ সালে। এর অনেক আগেই পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে সঙ্ঘের আগমন ঘটেছিল। ত্রিপুরায় আগত সঙ্ঘের প্রথম প্রচারক ছিলেন গণেশ দেবশর্মা। তিনিই প্রথমে ত্রিপুরাতে সঙ্ঘের বীজারোপণ করেছিলেন। তিনি যাঁদের নিয়ে সঙ্ঘের শাখা শুরু করেছিলেন, তাঁরা হলেন ত্রিপুরার স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রমথনাথ ভট্টাচার্য, শচীন দত্ত, বিনয় গাঙ্গুলি, তড়িৎ দাশগুপ্ত, শান্তি দাশগুপ্ত, পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী, অবনী দাস, শশাঙ্ক ভদ্র প্রমুখ। সেই সময়ে পীযূষকান্তি ভট্টাচার্যের বয়স ছিল প্রায় ৫-৬ বছর মাত্র। পীযূষদার সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো তিনি ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালে যখন দেশে জরুরি অবস্থা চলছিল, সেই সময় তিনি প্রায় ১৩ মাস গুয়াহাটি জেলে ছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে তাঁকে আরও প্রায় ৩ মাস কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছিল। এই হিসেবে তাঁকে ১৬ মাসের মতো এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। ৮ জুলাই গুয়াহাটিতে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তিনি সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের খরচ জোগাড় করতেন মায়ের পইতা বিক্রি করা টাকা থেকে।

ত্রিপুরার প্রথম প্রচারক গণেশ দেবশর্মা তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্যে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার কামান চৌমুহিনীতে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। তিনিই 'বিবেক বিতান' নামে প্রথম সঙ্ঘ কার্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন। আগরতলার শঙ্কর চৌমুহিনীর কাছে বিজয় কুমার স্কুলের মাঠে ত্রিপুরার প্রথম শাখা শুরু হয়েছিল হয়। সেই শখায় আসতেন পরিমল ভট্টাচার্য, মধুসূদন চক্রবর্তী, নিখিল চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, কাজল রায় বর্মণ-সহ আরও কয়েকজন। এর কিছুদিন পরে অরুন্ধতীনগরে, মেলারমাঠে, ভাটি অভয়নগরে, শিবনগরেও শাখা শুরু হয়।

গণেশ দেবশর্মা

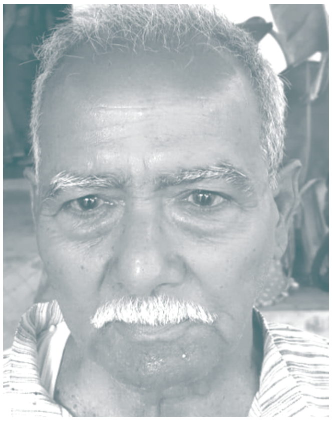

পীযূষকান্তি ভট্টাচার্য

১৯৫২ সালে ত্রিপুরায় প্রথম ৫ দিনের বর্গের আয়োজন হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী (মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর) ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবাসে এসেছিলেন। গণেশদার পরে সন্তোষদা ত্রিপুরাতে আসেন। সন্তোষদার সময়ে ত্রিপুরার সঙ্ঘ কার্যালয় কামান চৌমুহিনী থেকে স্থানান্তরিত হয়ে কৃষ্ণনগরে চলে আসে। এরপর লামডিং থেকে রবীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস নামে একজন প্রচারক এসেছিলেন। তাঁর সময়ে ত্রিপুরার উদয়পুর ও বিলোনিয়াতে শাখা শুরু হয়। উদয়পুরের সমীর চক্রবর্তী প্রথম সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের কোনো এক মাসে ত্রিপুরাতে স্বস্তিকা পত্রিকার কাজ শুরু হয়েছিল।

ত্রিপুরার স্বয়ংসেবকরা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের আর্থিকভাবে যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছিলেন। ত্রিপুরার স্বয়ংসেবকরা অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সঙ্ঘের কাজ যথাসাধ্য চালিয়ে গেছেন। ১৯৮০ সালে ত্রিপুরাতে সুদর্শনজী এসেছিলেন। ১৯৮০ সালে কলেজটিলা শাখা শুরু হয়। অভয়নগর হিন্দিস্কুলের মাঠের স্বয়ংসেবকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভবতোষ পাল, ব্রজলাল ধর, ধীমান দেববর্মা প্রমুখ।

ত্রিপুরায় আজ যে সঙ্ঘের কাজ চলছে তা এত সহজ ছিল না। রাজনৈতিক বিরোধিতা পূর্ণমাত্রায় ছিল। ত্রিপুরায় প্রথমে কংগ্রেস সরকার ছিল। তারপরে বামফ্রন্ট ২০১৮

সালের প্রথম দিক পর্যন্ত ত্রিপুরাতে শাসন করেছে। এছাড়া খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরোধিতা তো ছিলই। সর্বোপরি ছিল খ্রিস্টান মদতপুষ্ট চরম হিন্দুবিদ্বেষী উগ্রপন্থীরা। বামপন্থী, কংগ্রেস, খ্রিস্টান মিশনারি এবং ত্রিপুরার একটি বিশেষ মতাবলম্বী উগ্রবাদী — এই চার শক্তি সব রকমভাবে ত্রিপুরাতে সঙ্ঘের বিরোধিতা করে গেছে। তাই ত্রিপুরায় যাঁরা সঙ্ঘকে ভালোবাসতেন বা সঙ্ঘের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁদের অনেকেই বিভিন্নরকমের ভয়ের কারণে সঙ্ঘে সরাসরি যোগদান করতে পারেননি। যারা সরাসরি সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন, তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সঙ্ঘের কাজ করেছেন। তাঁরা কীরকম ঝুঁকি নিয়ে তখন ত্রিপুরাতে সঙ্ঘের কাজ চালিয়ে গেছেন, তা তাঁদের মুখ থেকে শুনলে আমাদের শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে ওঠে!

ত্রিপুরার ভয়ানক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই বা জেনেই ত্রিপুরাতে সারা দেশ থেকে শত শত সাহসী, নিবেদিতপ্রাণ এবং সুশিক্ষিত প্রচারকরা এখানে এসেছিলেন। তারা সকলেই ত্রিপুরার স্থানীয় ভাষা, উপভাষা, খাদ্যাভ্যাস ও রীতিনীতির সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। এই কারণেই পরবর্তী সময়ে অনেক স্থানীয় স্বয়ংসেবক প্রচারক ও পূর্ণকালীন হিসেবে বের হয়েছেন। ত্রিপুরায় সঙ্ঘকাজের কীরকম প্রতিকূল অবস্থা ছিল তার জ্বলন্ত ঘটনা হলো ত্রিপুরাতে সঙ্ঘের চারজন কার্যকর্তাকে খ্রিস্টান মদতপুষ্ট উগ্রপন্থীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে। এটি পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার স্বয়ংসেবকদের কাছে খুবই মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনা।

১৯৯৯ সালের ৬ আগস্ট, ত্রিপুরার ৮২ মাইল থেকে ২ কিলোমিটার দূরে কাঞ্চনছড়ায় কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাস থেকে সঙ্ঘের চারজন কার্যকর্তাকে ত্রিপুরার একটি উগ্রপন্থী দল অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। এই চারজন কার্যকর্তার মধ্যে ছিলেন ক্ষেত্রকার্যবাহ শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত। তিনি অসমের করিমগঞ্জের স্বয়ংসেবক হলেও কলকাতা নিবাসী ছিলেন। দ্বিতীয়জন পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত ত্রিপুরার বিভাগ প্রচারক দীনেন দে। তৃতীয়জন ত্রিপুরার বিভাগ প্রচারক সুধাময় দত্ত। তিনি স্বস্তিকার ব্যবস্থাপক হিসেবে

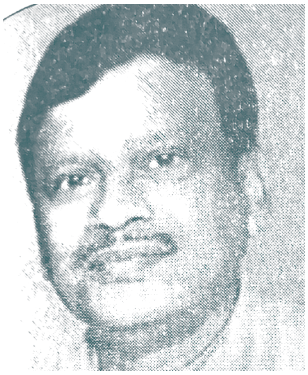

দীপক কুমার দেব

ব্রজেশ চক্রবর্তী

২৭/১বি, বিধান সরণিতে দীর্ঘদিন স্বস্তিকা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিও পশ্চিমবঙ্গের। চতুর্থজন শুভঙ্কর চক্রবর্তী। তিনিও পশ্চিমবঙ্গের ছিলেন। ত্রিপুরার হিন্দুবিদ্বেষী উগ্রপন্থীরা ২০০০ সালে জনজাতি হিন্দু সন্ন্যাসী শান্তিকালী মহারাজকে গুলি করে হত্যা করে।

ত্রিপুরার সঙ্ঘকার্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ত্রিপুরার জাতি-জনজাতি উভয়েরই যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ত্রিপুরার মাতৃমণ্ডলীর অবদানও অনস্বীকার্য। পীযূষকান্তি ভট্টাচার্যের বিবরণ অনুসারে, 'ত্রিপুরায় সঙ্ঘ যাত্রা এনেছিলেন গণেশদা, সন্তোষদা একে বিস্তৃত করেছেন। অল্পদিনে ত্রিপুরায় দাগ রেখে গেছেন ঝুনুদা ও গুরুদা। রামদার সময় সঙ্ঘ নিত্য শাখার পরিসর ছাপিয়ে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে'।

পীযূষদার বর্ণনানুসারে ত্রিপুরায় সঙ্ঘকার্যে নিজেদের জীবন-যৌবন উৎসর্গ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মধুকর লিময়ে (মধুজী), সুধাকর কুলকার্ণী, শশীকান্ত চৌথাইওয়ালে, বিনায়ক কানিতকর, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ। এই জীবনব্রতী প্রচারকদের অসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষায় ত্রিপুরা-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সঙ্ঘকাজ বিস্তার লাভ করেছে।

স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন কামনাদা, প্রশান্তদা, চিত্তদা, সত্যদা, রামনারায়ণদা, দুলালদা, দীপকদা, বিষ্ণুদার কথা, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে সঙ্ঘের কাজে প্রচণ্ড দায়িত্ব বহন করেছেন এবং সঙ্ঘের কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা না বলা দরকার। একসময় ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়াতে যখন সঙ্ঘের বদনামের খবরই শুধু প্রকাশ হতো, তখন মাঝে মাঝে 'অভিমুন্যু রায়' নামে একজনের লেখায় সঙ্ঘের সঠিক তথ্য এবং কার্যাবলী প্রকাশ হতো। স্বয়সেবকরা ওই লেখা পড়ে খুবই আনন্দ লাভ করত। সেই অভিমুন্যদা এখনও মাঝে মাঝে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা হিন্দু জাতীয়তাবোধের বিষয়ে লেখা লিখে চলছেন। ত্রিপুরায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঠিক তথ্য অভিমন্যুদাই লেখা পড়েই সবাই জানতে পারে।

ত্রিপুরার মাটি সঙ্ঘকাজের উর্বর ভূমি। কারণ ত্রিপুরার ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং সঙ্ঘও হিন্দুত্বনিষ্ঠ সংগঠন। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার কারণে বেশিরভাগ মানুষ সঙ্ঘ থেকে দূরে থাকতেন। কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে এখন ত্রিপুরার সামাজিক পরিবেশ অনুকূল হয়েছে। আজকাল নতুন প্রজন্মের তরুণে ও যুবকেরা সঙ্ঘমুখী হচ্ছে।

একদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং চরমপন্থার মতো দেশবিরোধী কার্যকলাপ যখন তুঙ্গে ছিল এবং অন্যদিকে বামপন্থা এবং নেহরুপন্থার মতো হিন্দুবিরোধী দলগুলির রমরমা চলছিল, ঠিক সেই চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যারা ত্রিপুরাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে টিকিয়ে রেখে আজকের এই জায়গাতে এনেছেন, সঙ্ঘের শতবর্ষে তাঁদের সবাইকে প্রণাম। তাঁরা মৃত্যুভয়কে জয় করে ত্রিপুরা রাজ্যকে ভয়মুক্ত করেছেন। □

সঙ্ঘকাজের পথ কণ্টকাকীর্ণ

সুনীলপদ গোস্বামী

বর্তমানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রার্থনায় বলি 'কণ্টকাকীর্ণ মার্গম্'। এই কণ্টকাকীর্ণ পথে বঙ্গভূমিতে দীর্ঘ ৮০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সঙ্ঘ কাজ চলছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয় (দার্জিলিং), দক্ষিণে সাগর আর মাঝে অসংখ্য নদী-নালা। আমরা তপোভূমি নর্মদার কথা শুনেছি। নর্মদার তীরে বহু সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গও তাই। বহু সাধকের সাধনস্থল এই বঙ্গভূমি।

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজী পড়াশোনার জন্য কলকাতায় আসেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরম পূজনীয় শ্রীগুরুজীর জীবনের অনেকটা সময় পশ্চিবঙ্গে কেটেছে। মুর্শিদাবাদের সারগাছি আশ্রমে অনেকদিন থাকেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কাছে তিনি দীক্ষা নেন। বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘকাজ শুরু করার জন্য ডাক্তারজী শ্রীগুরুজীকেই পাঠান। কিন্তু ডাক্তারজীর শরীর অসুস্থ হওয়ার জন্য কিছুদিন পরেই শ্রীগুরুজীকে নাগপুরে ফিরে যেতে হয়। কলকাতায় পাঠানো হয় বালাসাহেব দেওরসজীকে, যিনি পরবর্তীকালে তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক হন। কালিদাস বসু, সুনীলবরণ মুখার্জি, জয়দেব ঢোলে প্রমুখ শ্রীগুরুজী ও বালাসাহেবজীর সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। ১৯৪০ সালে ডাক্তারজীর দেহাবসানের পর শ্রীগুরুজী সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক হন। ফিরে যেতে হয় বালাসাহেব দেওরসজীকে। নাগপুরের সঙ্ঘকাজের মূল দায়িত্ব তাঁর ওপর। ১৯৭৪ সালে রজ্জুভাইয়ার সঙ্ঘকাজে কলকাতার দায়িত্ব ঘোষণা হলেও জরুরি অবস্থা ঘোষণা হওয়ায় তাঁকে আরও বড়ো দায়িত্ব দিয়ে দিল্লিতে পাঠানো হয়। পরবর্তীকালে রজ্জুভাইয়াও কলকাতার সঙ্ঘকাজের কণ্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ করেছেন। সুদর্শনজীও দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে বহুবার কলকাতায় এসেছেন। বর্তমান পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনজী সরকার্যবাহ হওয়ার পর তাঁর প্রথম কেন্দ্র হয় কলকাতা। অর্থাৎ সমস্ত সর-সঙ্ঘচালকেরই কোনো না কোনো সময়ে এই বঙ্গভূমির সঙ্গে একটা নাড়ির টান গড়ে ওঠে।

১৯৩৯-৪৯ এই সময়কালে বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘকাজ সর্বব্যাপী ছিল না। প্রথম শাখা শুরু হয় কলকাতায়। দেশবিভাজনের আগেই কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, নদীয়ার নবদ্বীপ, বর্ধমান ও মালদায় শাখা শুরু হয়। ১৯৪৭-এর আগে এখানে প্রচারক হিসেবে কাজ করেন নাগপুর থেকে আগত মনোহরলাল হরকরেজী, কালিদাস সালোটকরজী, মালদায় মুরলীধরজী। দেশ বিভাগের আগে শত শত যুবক শাখায় আসত। সেসময় পূর্ববঙ্গেও শাখা শুরু হয়। প্রচারক হিসেবে যান শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। সুকুমার ব্যানার্জি, রাজশাহীতে সঙ্ঘকাজ বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। দেশবিভাগ রুখে দেবার জন্য পঞ্জাবের মতো বঙ্গের স্বয়ংসেবকরাও আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সেসময় বঙ্গপ্রদেশের কাজের দায়িত্বে মনোহরলাল হরকরেজী। আজকে যেমন জেহাদি শক্তি, হিন্দু বিরোধী শক্তি এরাজ্যে সক্রিয়তা দেখাচ্ছে; সেই সময়েও কিন্তু একই চিত্র ছিল। তখন সুবিধাবাদী-সেকুলারপন্থী কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং মুসলিম লিগ তথা জেহাদি শক্তি সক্রিয়। ইংরেজরা তাদের মদত দিত। দেশ-বিভাগের প্রাক্কালে শ্রীগুরুজী যেমন অনবরত ভ্রমণ করেন, বঙ্গপ্রদেশের তৎকালীন প্রান্তপ্রচারক মনোহরলালজীও এরাজ্যের বহুস্থানে অনবরত ভ্রমণ করেন। বর্তমান বাংলাদেশের বহু প্রবুদ্ধ নাগরিকের সঙ্গে দেখা করে দেশবিভাজন সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তখন বুদ্ধিজীবী, প্রবুদ্ধ হিন্দু সমাজ এক নির্লিপ্তভাব দেখিয়েছিল— তার পরিণাম ১৯৪৬ সালে কলকাতায় এক ভয়াবহ জেহাদি আক্রমণ। সুরাবর্দির লক্ষ্য একটাই, সমগ্র বঙ্গকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। সেই সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর এবং অন্যান্য রাজনৈতিক এবং কিছু অরাজনৈতিক নেতৃত্বের আন্দোলনের ফলেই হিন্দু বাঙ্গালিদের হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়।

১৯৪৭-৫৭ অবধি দেশবিভাজনের ফলে বঙ্গ ও পঞ্জাবের অর্ধেকের বেশি জায়গা চলে যায় পাকিস্তানে। বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘের কাজ তখন সবেমাত্র ১০ বছরে পা রেখেছে। তখনই গান্ধীহত্যার মিথ্যা অপবাদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। স্বয়ংসেবকরা এই নিষেধাজ্ঞাকে ভয় করেনি। খুব অল্প স্থানেই তখন সঙ্ঘের কাজ। কিন্তু সেইসময় বরিষ্ঠ প্রচারকদের নেতৃত্বে সারা ভারতের সঙ্গে এরাজ্যের স্বয়ংসেবকরাও জেলে যায়। সত্য কোনোদিন পরাজিত হয় না। গান্ধী হত্যার কারণে সারা ভারতে চুয়াল্লিশ হাজার স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহ করেছিলেন। কংগ্রেস সরকার পরবর্তীকালে সঙ্ঘের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই সময় সক্রিয় ভূমিকা নেন জ্ঞানচন্দ্র সান্যাল

(গোরাদা), সুনীল মুখার্জি, সুকুমার ব্যানার্জি, রামপ্রসাদ দাস, সীতানাথ গোস্বামী, কালিদাস বসু, অহীন্দ্রকুমার দে প্রমুখ কার্যকর্তা।

নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার পর পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রচারক হিসেবে এলেন একনাথ রাণাডে। তখন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অসম ও ওড়িশাও ছিল। পূর্বাঞ্চলে সঙ্ঘকাজ বিস্তারের জন্য তিনি মধ্যপ্রদেশের বিভাগ প্রচারক অমলকুমার বসুকে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত প্রচারক করে নিয়ে এলেন। অমলদা ১৯৪৯-এ আসার পর কখনো প্রান্ত প্রচারক, কখনো প্রান্ত

অমল কুমার বসু

কেশবরাও দীক্ষিত

শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ

কার্যবাহ, কখনো প্রান্ত সঙ্ঘচালক রূপে এরাজ্যের স্বয়ংসেবকের পথনির্দেশ করেন এবং এরাজ্যে সঙ্ঘকাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেসময় (১৯৫০) এলেন কেশবরাও দীক্ষিত। মধুকর লিমায়ে গেলেন অসমে। গৃহী কার্যকর্তারূপে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন বসন্তরাও বাপট। মধ্যপ্রদেশে পড়াশোনা শেষ করে পশ্চিমবঙ্গকে কর্মজীবন হিসেবে বেছে নেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একজন আদর্শ গৃহী কার্যকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। এরাজ্যের কাজকে বাড়ানোর জন্য আরও অনেক গৃহী কার্যকর্তা এই কলকাতায় কাজ করেন। উল্লেখযোগ্য মানিকতলার শ্যামচাঁদ মল্লিক প্রমুখ।

দেশবিভাজনের সময় পূর্ববঙ্গ থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে যে সমস্ত হিন্দু এদেশে চলে আসছে, তাদের সহায়তার জন্য একনাথজীর নেতৃত্বে তৈরি হলো বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি। শ্যামচাঁদ মল্লিক বাস্তুহারা সহায়তার সমিতির মাধ্যমে সেবাকাজ করেন, সঙ্গে ভোঁওরলালজী। রাজস্থানের বাসিন্দা কলকাতার বহু স্বয়ংসেবক এখনও ভোঁওরলালজীর কথা শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। শিব ভগবান বাগেড়িয়াজী, যুগলকিশোর জৈথেলিয়াজী-র মতো শত শত গৃহী কার্যকর্তার অবদান অনস্বীকার্য এই রাজ্যে সঙ্ঘকাজকে পুষ্ট করার জন্য। ১৯৫০-র পর কলকাতায় এলেন বসন্তরাও ভট্ট। কণ্টকাকীর্ণ পথ কেমনভাবে সুগম করতে হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন বসন্তরাও ভট্ট। পরবর্তীকালে কল্যাণ আশ্রমে গিয়ে সেখানকার কাজ দাঁড় করান। দুইভাই বংশীলাল সোনী ও অনন্তলাল সোনী সম্পর্ক করেন বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর সঙ্গে যিনি পরবর্তীকালে রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন। শ্যামমোহন দে (স্কুল শিক্ষক ছিলেন) প্রমুখ পরবর্তীকালে এরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কাজ করেন। রথীনদার (রথীন চক্রবর্তী) কথা সবাই স্মরণ করে। বিষম পরিস্থিতিতে তাঁরা দশ হাতে আগলে রেখে ওইসব স্থানে সঙ্ঘকাজ বিস্তার করেন।

১৯৫৭-১৯৬৭--- পশ্চিমবঙ্গে অনেক বিষয়ে পটপরিবর্তন হয়। ১৯৫৭ সালে গোরক্ষা আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনে স্বয়ংসেবকেরা বড়ো ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬২ সালে যুদ্ধের সময় চীনা আক্রমণ এবং এখানকার কমিউনিস্টদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে জাগ্রত করেন স্বয়ংসেবকরা। বোমডিলা, তেজপুর, অসমের বিভিন্নস্থানে চীনা আক্রমণের সময় ট্রাফিক পুলিশের কাজ করেন। সেনাবাহিনীকে রক্তদান, ওষুধ ও খাবার পাঠানোর কাজে স্বয়ংসেবকরা অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৯৬৫-র যুদ্ধেও স্বয়ংসেবকরা পিছিয়ে থাকেননি। তখন সব জেলায় সঙ্ঘকাজ শুরু হয়েছে। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে যুদ্ধ হলেও পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকরা বিভিন্নভাবে ওইসময় সক্রিয়। ১৯৬২ সালে যে বামপন্থীরা চুপ হয়ে যায়, তারা ৫-৭ বছর পর আবার সংগঠিত হয়। শুরু হয় নকশাল আন্দোলন, যার লক্ষ্য সমস্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া। অনেক স্থানে শাখার ওপর হামলা হয়। কিন্তু চারু মজুমদার, কানু সান্যালের নকশাল বাড়ি আজ সঙ্ঘের দুর্গ। সেখানে জনমানসে হিন্দুত্বের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

সেসময় কিন্তু সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গও হয়। সেসময় বঙ্গের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে বিহার, অসম, ওড়িশার স্বয়ংসেবকরা আসতেন। বালাসাহেবজীর ছোটোভাই ভাউরাউজী ছিলেন ক্ষেত্র প্রচারক। ১৯৭০ সালে ভাউরাউজীর আহ্বানে দেশ-ধর্ম-সমাজ

রক্ষার জন্য বহু সাধু-সন্ত সারা ভারতকে পথ দেখান। এরাজ্যের কাজের জন্য বাইরে থেকে কেন প্রচারক আসবে? এখানকার প্রচারক চাই। এই আহ্বানে তৎকালীন প্রান্ত সঙ্ঘচালক কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী (মাস্টার মশাই)-র বড়ো ছেলে অরুণ কুমার চক্রবর্তী প্রচারক বের হন। ১৯৭১ সালে তিনি প্রচারক হিসেবে মালদা যান। রাধাগোবিন্দ পোদ্দার কলকাতা থেকে প্রচারক বের হয়ে হুগলী এবং পরে মালদায় যান। শ্যামলাল ব্যানার্জি কলকাতা থেকে প্রচারক বের হন। শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের প্রচারক পরম্পরা। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় অত্যাচারিত হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে। ভারতবর্ষের জওয়ানদের জন্য বাংলাদেশের জন্ম। বনগাঁ সীমান্তে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির মাধ্যমে হাজার হাজার পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া হয়। ক্যাম্প হয়েছিল বেনাপোতায়। সেসময় কলকাতায় প্রচারক রতনদা (বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য) মূলত পশ্চিমবঙ্গের লোক কিন্তু বড়ো হন দিল্লিতে। সেসময় শ্যামচাঁদদা, রতনদা, গজানন বাপটজী বনগাঁর মতো দুর্গম স্থানে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করেন।

উত্তরবঙ্গের হিলি বর্ডারে, মালদা বর্ডারে জওয়ানরা যুদ্ধে যাবার সময় এবং জয় করে ফেরার সময় বংশীদার নেতৃত্বে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। সমাজ যখন কষ্টে পড়েছে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা কোনোদিন পিছপা হননি---এগিয়ে এসেছেন। ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় রাগ পড়ল বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সঙ্ঘের ওপর। মধ্যরাতে কার্যালয় সিল করে দেওয় হয়। বিরোধী নেতাদের জেলে ভরা হয়। আজ অসহিষ্ণুতার কথা বলেন অনেকে। অসহিষ্ণুতা কী জিনিস তা জানতে হবে কংগ্রেসের কাছ থেকে। তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেবজীকে জেলে বন্দি করা হয়। শুরু হলো বিরোধীদের ওপর অত্যাচার। ননী পাল্কিওয়ালা লিখেছেন— ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ভারতের সংবিধানে 'সেকুলার' শব্দ ছিল না। ৪৪তম সংশোধনী করে, বিরোধীদের জেলে ভরে, সমস্ত সামাজিক সংগঠনকে রুদ্ধ করে রাতের অন্ধকারে সেকুলার ও সোশ্যালিস্ট শব্দ দুটি সংবিধানে প্রবেশ করানো হয়। আজও তার পরিবর্তন হয়নি। ১৯৭৭ সালে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর সারা ভারতের সঙ্গে এরাজ্যের কাজও বাড়তে থাকে। ১৯৭৭-৮৭ এই কালখণ্ডে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজের ব্যাপক বিস্তার হয়। জেলায় জেলায় তো কাজ ছিলই। এই কালখণ্ডে মহকুমা এবং খণ্ড স্তর পর্যন্ত সঙ্ঘের কাজ বাড়তে শুরু করে।

১৯৮৩ সালে হিন্দু সমাজকে জাগ্রত করার জন্য একটি ভাবাত্মক একাত্মতা রথযাত্রা হয়। কলকাতার ওপর দিয়ে একটি রথ যায়। এপ্রসঙ্গে মোরপন্থ পিংলেজীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শাসন। তারা জঘন্যরূপে এই রথযাত্রার বিরোধিতা করে। কিন্তু তারা কেউ আটকাতে পারেনি। মাইকে করে জনসাধারণের উদ্দেশে এই রথযাত্রা বয়কট করার আহ্বান জানায়। কিন্তু কোচবিহার থেকে চব্বিশ পরগনা পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে ধন্য করেছেন। এরপর এরাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে সঙ্ঘ কাজের আরও বিস্তার হয়। অনেক জেলায় সঙ্ঘের ১০০-র বেশি শাখা হয় তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলী, উ: ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর।

১৯৮৭-১৯৯৭---এই দশ বছরে আমাদের কণ্টকাকীর্ণ পথের অনেক কণ্টক দূর করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। ১৯৮৬ সালে যখন রামজন্মভূমির তালা খুলে গেল, যখন রামজন্মভূমি আন্দোলন শুরু হলো—সেই আন্দোলনের কত বিরোধিতা হয়েছে। যারা সেদিন বিরোধিতা করেছিল আজ তারা কোথায়? যে লালুপ্রসাদ যাদব বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁকে জেলে বসে রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন দেখতে হলো। যে মুলায়ম সিংহ গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল, যে গুলিতে কলকাতার ১৮-২০ বছরের যুবক রাম ও শরদ কোঠারী 'মন্দির ওহি বানায়েঙ্গে' ধ্বনি দিয়ে গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই মুলায়মকেও ঘরে বসে দেখতে হয়েছে যে রামমন্দিরের শিলান্যাস হচ্ছে! লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী সেদিন গর্জে উঠেছিল।

১৯৩৯ সালে বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘকাজ শুরু হয়, তার ৫০ বছর পর ১৯৮৯ সালে ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষের সময় কলকাতায় গড়ে উঠল 'কেশবভবন'--- প্রান্ত কার্যালয়। তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজী এর উদ্বোধন করতে আসেন। এসেছিলেন সেইসব প্রচারকেরা, যাঁরা একসময় বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘকাজ করেছিলেন। তখন ক্ষেত্র প্রচারক শ্রীকৃষ্ণরাও মোতলগ। ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষে বালাসাহেবজী আহ্বান করেন পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজ বিস্তারের জন্য এরাজ্যের যুবকরা প্রচারক বের হোক। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এরাজ্য থেকে ১১১ জন প্রচারক বেরোয়। এঁদের মধ্যে আজও অনেকে প্রচারক জীবন পালন করছেন। কেউ কেউ অসম, ত্রিপুরা, পঞ্জাব ও দিল্লিতে গেছেন। যে বঙ্গে একসময় বাইরে থেকে প্রচারক আসতেন, সেই বঙ্গের প্রচারকরা সমর্পিত মন নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গেছেন। এরাজ্যের চারজন কার্যকর্তা---শ্যামল সেনগুপ্ত, দীনেন দে, সুধাময় দত্ত, কাঞ্চন চক্রর্বতী---ত্রিপুরা থেকে অপহৃত এবং খুন হন। আমরা এঁদের ভুলতে পারি না। আজকে অসমে যে হিন্দুত্বের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তার পেছনে পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

সঙ্ঘের ওপর অত্যাচার সবসময় হয়েছে। ১৯৪৮, ১৯৭৫ এবং ১৯৯২ সালে তিন-তিনবার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও কিন্তু স্বয়ংসেবকরা পিছপা হননি। ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে একটি মাত্র সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ হতো, এখন সেখানে চারটি সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ হচ্ছে। কার্যকর্তা নির্মাণ হচ্ছে। পরিস্থিতি বিরুদ্ধ থাকলেও আমরা কার্যকর্তা নির্মাণের মাধ্যমে নবনির্মাণের কাজে সময় দিতে পেরেছি, আমরা পিছিয়ে পড়িনি। হিন্দু সমাজকে জাগ্রত করার জন্য আমরা সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ করেছি।

কল্যাণী মহাশিবিরে (১৯৯২) ১৮ হাজার স্বয়ংসেবক পূর্ণ গণবেশে তিনদিন উপস্থিত ছিলেন। সারা ভারতের কাছে এটি একটি উদাহরণ।

১৯৯৭ থেকে ২০০৭—এই কালখণ্ড আমাদের প্রদেশে সঙ্ঘকাজের অনেক বিস্তার হয়েছে। আমরা সুদূর আন্দামানেও সঙ্ঘের কাজের বিস্তার করেছি। আমরা সিকিমের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির চা-বাগান অঞ্চলে শাখা শুরু করেছি। ২০০৫ সালে আন্দামান সুনামি হয়। সেসময় সেখানে সঙ্ঘ যে সেবাকাজ করে তা আজও সেখানকার হিন্দু সমাজ নতমস্তকে স্মরণ করে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বয়ংসেবকরা বিভিন্ন দ্বীপে যান সেবাকাজ করতে।

২০০৩ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ একটি প্রান্ত ছিল—দক্ষিণে সমুদ্র থেকে উত্তরে সিকিম, উত্তর পূর্বে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র। সেসময় পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী। মাননীয় সরকার্যবাহ মোহনরাও ভাগবত পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজের বিস্তার ও দৃঢ়ীকরণের জন্য দুটি প্রস্তাব দেন। প্রস্তুতি আমাদের ছিল। উত্তরবঙ্গে কাজের বিস্তারে বংশীলাল সোনী এবং ডাঃ দেবব্রত সিংহের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। গণেশ দেবশর্মা উত্তরবঙ্গের কাজের জন্য সমর্পিত জীবন। তিনবিঘা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেন মনমোহন রায়। বামপন্থীরা তিনবিঘা আন্দোলনকে ভেঙে দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। দক্ষিণবঙ্গে সাড়ে ৮ কোটি জনসংখ্যা। এখানেও কাজের বিস্তার ও দৃঢ়ীকরণের জন্য অনেক চিন্তাভাবনা করে ২০২১ সালে দু-ভাগে বিভক্ত হয়—দক্ষিণবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ আর হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ নিয়ে মধ্যবঙ্গ।

আমাদের প্রদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড়ো বড়ো কার্যক্রম হয়েছে। বঙ্গপ্রদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অশুভ শক্তি ছিল। দেশবিভাগের সময় তিনটি অশুভ শক্তি ছিল—মুসলিম লিগ (জেহাদি শক্তি) তাকে সমর্থন করল রাষ্ট্রবিরোধী বামশক্তি আর তাকে সমর্থন করে কুচক্রী সেকুলার শক্তি। দেশ বিভাজন হয় জাতির ভিত্তিতে। মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে থাকবে না—এই দাবিতে পাকিস্তান তৈরি হয়। কিন্তু আমরা দেখলাম জনবিনিময় পঞ্জাবে হলো কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হলো না। ১৯৬৭-২০১০ পর্যন্ত ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশ হলো পশ্চিমবঙ্গে--- কোটি কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে এখন আবার যোগ দিয়েছে রোহিঙ্গা মুসসমরা। তারা এখন আবার হিন্দুদের আক্রমণ করছে। ৩৪ বছরের বাম শাসন হিন্দুশক্তিকে হীনবল করার ষড়যন্ত্র সুচারুরূপে করেছিল। ২০১১-তে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক শক্তির পরিবর্তন হলো। তখন তারা বড়ো বড়ো আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল, যে ভুল আগের শাসকরা করেছিল, তারাই একই ভুল করল। জেহাদি শক্তিকে এরাও প্রশ্রয় দান করল। এর পরিণামে দেখলাম রামনবমী উৎসবের বিরোধিতা, সরস্বতী পূজায় বিরোধিতা মা দুর্গার পূজায় বিধিনিষেধ, বিসর্জনে বিধিনিষেধ, 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির বিরোধিতা। কিন্তু এর ফল হলো উলটো। 'জয়শ্রীরাম' ধ্বনিকে সামনে রেখে হিন্দু সমাজ জাগ্রত হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হলো। এটি একটি বড়ো প্রাপ্তি। সামাজিক জাগরণ। ১৯৩৯ থেকে ২০২১—প্রায় ৮১ বছরে যেটি হয়নি সেটিই হলো---হিন্দু শক্তির রাজনৈতিক উত্থান---যা দেখে রাষ্ট্রবিরোধীরা ঘাবড়ে গেল। তারা ঘাবড়ে গিয়ে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের পথ বেছে নিল। এই যে হিন্দুশক্তির উত্থান---যেটা ১৯৪৭ সালে হয়নি, যেটা ১৯৭৫ সালে হয়নি, যেটা ১৯৯০ সালে হতে পারেনি---সেটা ২০১৯ সালে হলো---একটি রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত হলো। চল্লিশ শতাংশ মানুষ একপক্ষে মত পোষণ করল---সংগঠিত হিন্দুশক্তি। এই বিষয়টা রাষ্ট্রবিরোধীদের মনে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করল। ফলে যারা মুখে 'গণতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ' ইত্যাদি শব্দ বলে, তারা জেহাদি শক্তির সঙ্গে হাত মেলাল। আমরা দেখলাম, যারা ২০ বছর পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করেছে, যারা ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করেছে, সেই দুটি রাজনৈতিক দল নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে বিপন্ন করে জেহাদিশক্তির সঙ্গে হাত মেলাল। তৃণমূল দলও জেহাদি শক্তিকে কাছে পাওয়ার জন্য প্রকাশ্যে বলা শুরু করল--- পশ্চিমবঙ্গে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বসবাস করার ব্যবস্থা করা হবে, পশ্চিমবঙ্গে সিএএ-র বিরোধিতা করা হবে, এখানে যারা রামের কথা বলবে তাদের নিয়ে খেলা হবে। এক অদ্ভুত খেলা ২০২১-এর ২ মে'র পর থেকে আমরা দেখছি। বর্তমান সময় সঙ্কটময়। বর্তমানের পথও কণ্টকাকীর্ণ। ডাক্তারজী যে চিন্তা নিয়ে ১৯৩৯ সালে শাখা শুরুর জন্য জন্য শ্রীগুরুজীকে বঙ্গভূমিতে পাঠিয়েছিলেন, যাঁরা নানাসময় আমাদের পথনির্দেশ করেছিলেন, যাঁরা কণ্টকাকীর্ণ পথে কাজ করছেন--- তাঁরা অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন।

এই কণ্টকাকীর্ণ পথকে আমরা সুগম করব। বঙ্গভূমি একসময় সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছে। আমাদের মহাপুরুষ ঋষি অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, মাস্টারদা সূর্য সেন--- তাঁদের বংশধর আমরা। তাঁরা হিন্দুসমাজকে জাগ্রত করার জন্য কাজ করেছেন। 'ওই দেখ চেয়ে নতুন সূর্য'--- এই গান আমরা সঙ্ঘের শাখায় গাই। আমরা সবাই তাকিয়ে আছি সেই নতুন সূর্যের দিকে। তাই কবি গেয়েছেন---'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নত শির নাহি ভয়।'

আমাদের পূর্বপুরুষ যাঁরা নিজেদের তন-মন-ধন সমর্পণ করে আমাদের রাস্তা দেখিয়েছেন---তা ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য---সেই পথ সবসময় কণ্টকাকীর্ণ। তাঁরা জেলকে ভয় পাননি, তাঁরা পুলিশকে ভয় পাননি, তাঁরা আক্রমণকে ভয় পাননি। আদর্শের জন্য তাঁরা নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে গেছেন। তাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে উদাহরণ দাঁড় করিয়ে গেছেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে সেই পথকে আরও প্রশস্ত করি।

(অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য)

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর পুণ্যস্মৃতি

কালিদাস বসু

প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজীকে দেখার আগে কিংবা তাঁর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ কিছু শোনার আগে তাঁর লিখিত পত্রের কথা জানা ও শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ঠিক তারিখ স্মরণ করতে না পারা একটি প্রাক্ সন্ধ্যাকালে আমরা মানিকতলা শাখার স্বয়ংসেবকরা একত্রিত হয়েছি প্রার্থনা করার জন্য। প্রার্থনা আরম্ভ হওয়ার আগে শ্রীবালাসাহেব দেওরসজী আমাদের সামনে এসে বললেন যে, রাজগীর থেকে ডাক্তারজীর চিঠি আজই তিনি পেয়েছেন এবং তার অংশবিশেষ আমাদের পড়ে তিনি শোনাচ্ছেন। কিশোর বয়সের স্মৃতি থেকে মন্থন করা এখন আমার সম্ভব হচ্ছে না যে তাঁর পত্রের অন্যান্য বিষয়বস্তু কী ছিল। কিন্তু স্পষ্টভাবে একথা মনে আছে যে তিনি আমাদের কলকাতা শাখার স্বয়ংসেবকদের তাঁর অন্তরের স্নেহ জানিয়েছেন। সঙ্ঘে আসা পর্যন্ত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের অপরিসর পরিধিতে এ ধারণা ছিল না যে যাকে জানি না, যাকে চিনি না কিংবা যাকে দেখিনি তাকে উদ্দেশ্য করে অন্তরের শুভকামনা জানানো সম্ভবপর। তাই সেই সন্ধ্যায় ডাক্তারজীর লেখা প্রথম শোনা সেই চিঠি মনের মধ্যে এক অনাস্বাদিত অনুভূতির সঞ্চার হয়েছিল।

ওই বছরের ওই মাসেরই শেষের দিকে ডাক্তারজীকে চাক্ষুষ করার সুযোগ আমরা পেয়ে গেলাম। সেইসময় হিন্দু মহাসভার অধিবেশন কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল। সেই অধিবেশনে যোগ দিতেই ডাক্তারজী কলকাতায় এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন পরমপূজনীয় শ্রীগুরুজী, ভাউরাও দেওরস প্রমুখ সঙ্ঘের কর্ণধারগণ। যেদিন তিনি কলকাতায় পৌঁছলেন খুব সম্ভবত তারপরের দিন বিকালে মানিকতলা সঙ্ঘস্থানে ডাক্তারজী উপস্থিত হলেন প্রার্থনার কিছুক্ষণ আগে। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন। প্রার্থনান্তে শাখা শেষ হবার পর অতি অল্পক্ষণের জন্যই তাঁর উপস্থিতি আমাদের সঙ্ঘস্থানে ছিল। কী বলেছিলেন তিনি তখন তা কিছুই মনে নেই। কেবল মনে আছে তাঁর মুখের হৃদয়শান্তিকারী স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাসিটুকু, যে হাসি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে দূরকে নিকট করা যায়, অজানা হয়ে ওঠে একান্ত আপনার।

তখন কলকাতায় কেবল একটি ছোট্ট শাখা, প্রদেশের অন্য কোথাও সঙ্ঘের শাখা নেই। কলকাতা শাখার স্বয়ংসেবকদের একদিন বৌদ্ধিক রাখা হলো। সঙ্ঘের কার্যালয় তখন ২৫নং আমহার্স্ট স্ট্রিটে, যে বাড়িতে হিন্দু শিল্প বিদ্যালয়ও অবস্থিত ছিল। সেই বিদ্যালয়েরই দোতালার নাতিপ্রশস্ত একটি ঘরে বিকেলবেলায় আমরা স্বয়ংসেবকরা একত্রিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতার কাছ থেকে সঙ্ঘবিষয়ে কিছু শুনতে পাব। শুনেছিলাম যেন যে তাঁরই ভাষণ হবে। ধ্বজপ্রণামের পর আমরা সবাই বসলাম। ডাক্তারজী একটি চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন। বলা কিন্তু ভাষণ নয়। তিনি শ্রীগুরুজীকেই নির্দেশ দিলেন আমাদের সামনে কিছু বলার।

শ্রীগুরুজী ঘরের উত্তরদিকে রাখা একটি লম্বা টেবিলের ওপরে বসে তাঁর ইংরেজি বক্তৃতা আরম্ভ করেন। শ্রীগুরুজীর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য জীবনে সেই প্রথম। সঙ্ঘে আসার কয়েক মাস পরে নাগপুরের অধিকারী শিক্ষণ বর্গে যোগ দেবার সুযোগ খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবে ভাগ্যে ঘটে গেল। বালাসাহেব দেওরসজী টাঙ্গা থামিয়ে নামলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। জানলাম ডাক্তারজীর পরমপূজ্য খুল্লতাত তিনি—আবাজী হেডগেওয়ার। ডাক্তারজীর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বগঠনে আবাজীর অবদানও ছিল যথেষ্ট। ১৯৪০ সালের সেই শিক্ষা বর্গে এ ধারণাই আমরা মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম যে, ৪০ দিনের নিরবচ্ছিন্ন আবহাওয়ায় ডাক্তারজীর সহজ সান্নিধ্য আমরা পাব। আমরা যখন নাগপুরে পৌঁছাই তখন পুণায় ওটিসি চলছিল। ডাক্তারজী তখন সেখানে। ওখান থেকেই তিনি নাগপুরে আসবেন এই আশাই আমরা সবাই করেছি। ১৯৪০ সালের নাগপুরের ওটিসি-তে সঙ্ঘের বর্তমান প্রার্থনার আরম্ভ। বর্গে যোগদানকারী প্রতিটি স্বয়ংসেবকের মুখে মুখে প্রার্থনার ভিন্ন ভিন্ন পঙ্ক্তি উচ্চারিত হতো। নতুন প্রার্থনার সবটুকু কণ্ঠস্থ করার স্বতোৎসারিত ইচ্ছা সবার। এই উচ্চারিত প্রার্থনা অভ্যাসের সঙ্গে চলেছিল আরেকটি গুঞ্জন—ডাক্তারজী

কবে আসছেন। স্বয়ংসেবকরা তাদের নিজেদের জানা-অজানা সূত্র থেকে ডাক্তারজীর আগমনের সম্ভাব্য তারিখটুকু প্রচার করতে কসুর করেনি।

আমাদের ভাগ্যে কিন্তু অনেকদিনের জন্য তাঁকে পাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। দীর্ঘদিনের অসুস্থতা নিয়ে তিনি যখন নাগপুরে এলেন তখন বর্গের মাত্র কয়েকদিন বাকি।

নীল সিটি হাইস্কুলের হলঘরের পাশেই ছিল বঙ্গপ্রদেশের স্বয়ংসেবকদের থাকার জায়গা (হলঘরের অপর এক ধারে বর্গের কার্যালয়)। একদিন সকালে ডাক্তারজী আমাদের হস্টেলে এলেন— বসলেন সেই কার্যালয়ে। আরেকদিন দুপুরে বৌদ্ধিকবর্গে উপস্থিত হলেন। যে চেয়ারে ডাক্তারজী বসবেন তার ওপর দুটি বালিশ দিয়ে বসাটা একটু আরামপ্রদ করতে চাইলেন কয়েকজন স্বয়ংসেবক। ডাক্তারজী বৌদ্ধিক বর্গে উপস্থিত হয়েই কিন্তু সেই বালিশ সরিয়ে ফেলতে বললেন।

সেই বছরের ওটিসি-র সমারোপ উৎসবে রেশিমবাগ সঙ্ঘস্থানে ডাক্তারজী উপস্থিত থাকবেন এরকম আমরা শুনেছিলাম প্রত্যেকটি সম্ভাব্য সূত্র থেকে। সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত হয়ে স্বয়ংসেবকেরা অধীর আগ্রহে ডাক্তারজীর আগমন প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু ডাক্তারজী এলেন না। পরে শুনেছিলাম যে ডাক্তারজী আসতে পারেননি চিকিৎসকের অসম্মতির জন্য। আর পরে শুনলাম যে ডাক্তারজীর সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত হবার ইচ্ছা ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত হবার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেকে প্রস্তুতও করছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর চিকিৎসকেরা সম্মত হননি ডাক্তারজীকে বাইরে যেতে দিতে, তাই শ্রীগুরুজী ডাক্তারজীর সমস্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত হওয়ার থেকে অতিকষ্টে বিরত করেন।

তারপরের দিন সকালে নীলসিটি হাইস্কুলের বাইরের প্রাঙ্গণে বৌদ্ধিক মণ্ডপে স্বয়ংসেবকেরা একত্রিত হয়েছে সমারোপ ভাষণ ও প্রার্থনার জন্য। কয়েকবারই ডাক্তারজীর আসার কথা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের মধ্যে আসতে পারেননি, তাই সেই সকালেও আমরা দোদুল্যমান ছিলাম ডাক্তারজীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সম্পর্কে। শেষপর্যন্ত স্বয়ংসেবকেরা উৎফুল্ল হয়ে উঠল ডাক্তারজীকে দেখে। প্রত্যেক প্রদেশ থেকে একজন করে প্রতিনিধি সামান্য কিছু কথায় নিজ নিজ প্রদেশের সঙ্ঘকার্যের আগামীদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করার পর মাদ্রাজ প্রদেশের নব-প্রতিজ্ঞা-প্রাপ্ত একজন স্বয়ংসেবকের স্বল্প ভাষণ হলো। তারপর ডাক্তারজীর ভাষণ যা নাকি 'অন্তিম ভাষণ' রূপে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের নিকট একান্ত প্রিয় ও পুনঃ পুনঃ পঠিত। নিজের জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে যিনি দেশের কথা ভেবেছেন, শরীরের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু যিনি ব্যয়িত করেছেন সমাজের কল্যাণ কামনায়, মন ও প্রাণ দিয়ে যিনি সদাসর্বদা চিন্তা করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংগঠন সম্পর্কে, তিনি যখন আসমুদ্র-হিমাচল অখণ্ড সমাজের এক ক্ষুদ্র অথচ স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখলেন তাঁর সামনে, তখন তাঁর হৃদয়ের প্রশান্ত পরিতৃপ্তিবোধ প্রকাশিত হয়েছিল এই ভাষায় যে আজকে তিনি তাঁর স্বপ্নের বাস্তব রূপরেখা দেখছেন।

নাগপুরের চল্লিশদিনের অধিকারী শিক্ষণ বর্গ এইভাবেই শেষ হয়ে এল। তারপরের দিনেই আমাদের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের তারিখ। সেইজন্য রাত্রে বঙ্গপ্রান্তের স্বয়ংসেবক আমরা আমাদের প্রদেশের প্রচারক বিঠ্‌ঠলরাওজী পাত্‌কির সঙ্গে ডাক্তারজীর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। বাড়ির দরজায় আমরা যখন উপস্থিত হয়েছি তখন শ্রীগুরুজী বেরিয়ে আসছেন। তিনি পাত্‌কিজীকে বললেন, যে আমরা যেন বেশিক্ষণ সেখানে না থাকি।

ডাক্তারজী যে ঘরে ছিলেন আমরা তার মধ্যে প্রবেশ করলাম। আয়তাকার বিশিষ্ট ঘরটির এক প্রান্তে দেওয়াল জুড়ে একটি চৌকি ছিল। ঘরের স্তিমিত আলোক ঘরটির পক্ষে একান্ত অপর্যাপ্ত ছিল। ডাক্তারজী চৌকিতে শুয়েছিলেন। চৌকির বিপরীত দিকে আমরা সতরঞ্চির ওপর বসলাম। আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি উঠে বসলেন, এতক্ষণ শুয়েছিলেন। উঠে বসতেই তাঁর মুখখানা প্রশান্ত হাসিতে ভরপুর হয়ে উঠল, মাথায় তখন টুপি ছিল না। এই তাঁর সেই হাসি যার প্রথম পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম পূর্বকথিত মানিকতলা সঙ্ঘস্থানে। ডাক্তারজী বললেন---ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পদ্মরাজ জৈন বলেছেন যে বঙ্গপ্রদেশে কাজ বাড়াতে হবে, তা তোমরা কী বল? আমরা আমাদের মতো করে উত্তর দেবার কিছু চেষ্টা করলাম।

আমাদের উত্তর শুনে তিনি সরবে হেসে উঠলেন। এই বোধ হয় তাঁর সরব হাসির প্রকৃতি যার সম্পর্কে নানা ঘটনা সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে তাঁর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। আমাদের সঙ্গে কিছু কথা তিনি বাংলাভাষাতেও বললেন। আমাদের ভাগ্যে কিন্তু বেশিক্ষণ সুযোগও ছিল না, তাঁকে প্রণাম করে বললাম যে আমরা তারপরের দিনই রওনা হচ্ছি। তিনি আবার হাসিমুখে আমাদের সেই কথা শুনলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এলাম, তাঁর অপূর্ব হাসির রেশটুকু কিন্তু আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অতি অল্পদিনের স্বয়ংসেবক জীবনের অভিজ্ঞতায় সঙ্ঘ-পরিচিতি অতি সামান্যই ছিল। কিন্তু কিশোর মনের হৃদয়তন্ত্রীতে এই আঘাত অতি গভীরভাবে বেজেছিল যে, নাগপুরের সব আবহাওয়া যেন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে ডাক্তারজীর দীর্ঘ অসুস্থতার জন্য।

কলকাতায় পৌঁছে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সংবাদ পাবার জন্য সাগ্রহে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের সবাইকার মনের প্রার্থনা ভগবানের কাছে যে ডাক্তারজী নিরাময় হয়ে উঠুন, তাঁর হৃত-স্বাস্থ্য তিনি ফিরে পান। নাগপুর থেকে ফেরার কয়েকদিন পরেই সকালে একজন প্রচারক অশ্রুসজল চোখে জানালেন যে, নাগপুর থেকে টেলিগ্রামে জানিয়েছে ডাক্তারজী আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর চোখের জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল ডাক্তারজীর হাসি-ভরা মুখটুকু যা প্রত্যক্ষ করেছি মাত্র কয়েকদিন আগে। জীবন-মরণ-জয়কারী তাঁর অম্লানবদনের অফুরন্ত প্রশান্ত হাসি!

(লেখক পূর্বক্ষেত্রের প্রয়াত সঙ্ঘচালক)

সঙ্ঘের শাখাই স্বয়ংসেবকদের সাধনাস্থল

অমিত কুমার চৌধুরী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রী বালাসাহেব দেওরস, কোনো তাত্ত্বিকভাবে নয়, অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় সঙ্ঘ কী, তার ব্যাখ্যায় বলেছিলেন— সঙ্ঘ মানে শাখা, শাখা মানে কার্যক্রম। সঙ্ঘকে বুঝতে হলে শাখাকে বুঝতে হবে, তবেই সঙ্ঘকে বোঝা যাবে। শাখা কী? ভারতে সঙ্ঘের শাখার সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৮০ হাজার। একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দৈনিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক ঘণ্টা কিছু স্বয়ংসেবক মিলিত হন। শিশু, বালক, কিশোর, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ— যেকোনো বয়সের মানুষই শাখায় আসতে পারে। সেখানে তারা এক ঘণ্টা শারীরিক ও বৌদ্ধিক কার্যক্রম করে থাকে। তিনভাগ সময় শারীরিক ও একভাগ সময় বৌদ্ধিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। দেশজ খেলাধুলা, সমতা (প্যারেড), ব্যায়াম, প্রাণায়াম, ধ্যান, দণ্ড (লাঠি) চালনা ইত্যাদি শারীরিক কার্যক্রম স্বয়ংসেবকরা সঙ্ঘস্থানে করে থাকে। একসঙ্গে বসে তারা দেশাত্মবোধক গান গায়, অমৃত বচন, বোধকথা, মহাপুরুষদের প্রেরণাদায়ক জীবন নিয়ে আলোচনা, দেশের সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা ইত্যাদি বৌদ্ধিক কার্যক্রম শাখায় হয়ে থাকে। শেষে ত্যাগের প্রতীক গৈরিক ধ্বজের সামনে সকলে সমবেত হয়ে বুকে হাত দিয়ে সংস্কৃত ভাষায় প্রার্থনা করে থাকে। সেই প্রার্থনায় স্বয়ংসেবকরা বলে থাকেন— হে আমাদের পুণ্যভূমি, মাতৃভূমি ভারতমাতা তোমাকে প্রণাম জানাই। এই হিন্দুরাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই প্রার্থনা স্বয়ংসেবকরা শাখায় সমবেত হয়ে প্রতিদিন করে থাকে।

প্রতিদিন সঙ্ঘস্থানে স্বয়ংসেবকরা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রতি নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, দায়িত্ব, কর্তব্যের বিষয়ে শেখে। স্বামীজী বলেছেন, 'সারাজীবন পরের জন্য করবি, নিজের জন্য কিছুই চাইবি না। মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অন্তিম উপদেশে পাণ্ডবদের বলেছিলেন যে, দেশ তোমার জন্য কী করেছে তা কখনো জিজ্ঞাসা করবে না, তুমি দেশের জন্য কী করছ তা সর্বদা ভাববে। সঙ্ঘের বর্তমান সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতও একই কথা বলেছেন যে, সঙ্ঘে এলে আপনি কিছু পাবেন না, বরং আপনার কিছু থাকলে সেটাও চলে যাবে। এই উচ্চ আদর্শ নিয়ে স্বয়ংসেবকরা শাখায় আসে। শাখা হচ্ছে দেশপ্রেমের পাঠশালা, যেখানে দেশকে কিছু দিতে হবে আর পাওয়া যাবে স্বদেশপ্রেমের আদর্শ। এই নিঃস্বার্থ ভাবনা সকল দেশবাসীর মনে জাগ্রত হোক এটাই চায় সঙ্ঘ।

'আমি নই আমরা'— এই ভাবনা তৈরি হয় শাখায়। শাখার কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বয়ংসেবকরা সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, নিখাদ দেশপ্রেমের শিক্ষা পায়। কোনো কাজ প্রতিদিন নিষ্ঠাভরে কেউ করলে, সেটি আর নিছক কোনো সাধারণ কাজ থাকে না, সেটা হয়ে ওঠে সাধনা বা তপস্যা। এই সাধনাই সঙ্ঘ করে চলেছে বিগত একশো বছর ধরে। দৈনিক শাখার মধ্য দিয়ে এই ভাবনাই জাগ্রত হয় যে, 'আমি' নই, 'আমরা'। আমি একা নই, অনেকের মধ্যে আমি। এতে একাকীত্ব দূর

হয়, সমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে, সমাজ শক্তিশালী হয়। এইভাবেই ‘এক’ থেকে ‘আমরা’ হওয়ার মাধ্যমে সমাজ সংগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রাচীন মুনি-ঋষি রচিত বৈদিক সংগঠন মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে সেই একাত্মতার ভাবনা শাখায় গড়ে ওঠে। ‘ওঁ সংগচ্ছধ্বম্ সংবদ্ধবম্ সং বো মনাংসি জানতাম্।’ অর্থাৎ, একসঙ্গে বলো, একসঙ্গে চলো, আমাদের সকলের মন এক হোক। এটাই সঙ্ঘচেতনা, সঙ্ঘোপলব্ধি, ঐক্যবদ্ধতা।

দেশের যেখানে যখন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খড়া, বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ঘটনা, মহামারী, যুদ্ধ হলে স্বয়ংসেবকরা সর্বাগ্রে সেখানে পৌঁছে দেশবাসীর পাশে দাঁড়ায়। শাখা এই শিক্ষাই দেয় যে, দেশের মানুষ আমাদের রক্ত, আমাদের ভাই। তাঁদের দুঃখ-বেদনা আমাদেরও দুঃখ বেদনা। শাখার মাধ্যমে সঙ্ঘ স্বয়ংসেবক তৈরি করে, নেতা নয়। শাখায় ব্যক্তির নানে জয়ধ্বনি দেওয়া হয় না, সেখানে হয় ভারতমাতার জয়ধ্বনি। স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে শেখে সকলেই। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে অরুণাচল— সঙ্ঘবোধের মাধ্যমে এক অটুট, ঐক্যবদ্ধ ভারতভূমি, যেখানে নেই কোনো বর্ণভেদ, ভাষাভেদ। সেখানে সকলে ভারত জননীর সন্তান। এই ভাবনাই স্বয়ংসেবকদের মনে জাগ্রত হয়।

স্বয়ংসেবকরা প্রতিদিন শাখায় যায়। কোন শাখায়? সঙ্ঘের শাখায়। শাখার সংজ্ঞা আরও স্পষ্টভাবে দিয়েছেন শ্রী বালাসাহেব দেওরস— ‘‘সঙ্ঘের শাখা কেবল খেলাধুলা বা কুচকাওয়াজ করার স্থান নয়, আড়ম্বরহীনভাবেই সজ্জনদের সুরক্ষার অভিব্যক্তি, তরুণ-যুবকদের কু-অভ্যাসাদি থেকে মুক্ত রাখার সংস্কারপীঠ, সমাজের ওপর আগত আকস্মিক বিপত্তি বা সংকটে দ্রুত ও পক্ষপাতহীন সহায়তা দানের আশাকেন্দ্র, মহিলাদের নির্ভয়তা এবং সুসভ্য আচরণপ্রাপ্তির আশ্বাসস্থল, দুষ্ট ও দেশদ্রোহী শক্তির ওপর নিজ প্রভাব স্থাপনকারী শক্তি। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ্য কর্মী ও কার্যকর্তা যাতে পাওয়া যায় তার প্রশিক্ষণদানকারী বিদ্যাপীঠ হলো সঙ্ঘশাখা।’’

জননী-জন্মভূমি, অর্থাৎ দেশমাতৃকার সঙ্গে তাঁর সন্তানদের যে সম্পর্ক, তা হলো রাষ্ট্রীয়তা। ভারতে সেই রাষ্ট্রচেতনা হলো ‘হিন্দুত্ব’। ‘রাষ্ট্রীয়’ শব্দের অর্থ হলো হিন্দু, সঙ্ঘ শব্দের অর্থ সমগ্র হিন্দুসমাজের সংগঠন। এই হিন্দুসমাজকে সংগঠিত করার দায়িত্ব যারা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তারাই স্বয়ংসেবক। সঙ্ঘের শাখা পরিচালিত হয় কার্যকর্তা নির্মাণেক জন্য। সঙ্ঘের শাখা হচ্ছে সমাজ জাগরণ ও রাষ্ট্রনির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস। শাখা থেকে নির্গত এই শক্তির প্রভাব সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়ে। এর ফলে একদিন সমাজ ধীরে ধীরে সঙ্ঘময় হয়ে উঠবে। তখন সমাজ ও সঙ্ঘ আর পৃথক থাকবে না। সঙ্ঘের কার্যকর্তারা শাখার মাধ্যমে সমগ্র হিন্দুসমাজকে সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত রয়েছেন। কাজটি খুব সহজ নয়, বরং ভীষণ কঠিন। সংগঠন করা মানে মানুষকে এক করা, বিভাজন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজ বর্ণ, ভাষা, মত-পথ, রাজনীতি ইত্যাদি নানাভাবে বিভাজিত। সেই সমাজকে এক করা প্রায় অসম্ভব বলে একদা মনে করা হতো। সেই কঠিন কাজটিই হাতে তুলে নেয় সঙ্ঘ। সঙ্ঘ এটাও জানে যে, সমগ্র সমাজ শাখায় সম্মিলিত হবে না। তাই সঙ্ঘকেই সমাজের কাছে যেতে হবে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গিয়ে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। দেশ শাসন থেকে দেশসেবা— সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে আজ স্বয়ংসেবকদের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সঙ্ঘ শাখার মাধ্যমে ব্যক্তিনির্মাণের কাজে রত। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সমাজের সব কাজে যুক্ত।

সঙ্ঘের কাজ হলো ব্যক্তিনির্মাণ। সঙ্ঘকাজ কয়েক বছরের জন্য নয়, এটি একটি ধারাবাহিক, নিরবচ্ছিন্ন কাজ যা গত একশো বছর ধরে হয়ে চলেছে। হাজার বছরের পরাধীনতার গ্লানি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানবিকতার পতন হিন্দুসমাজকে যেভাবে পিছিয়ে দিয়েছে, রাতারাতি কোনো যাদুমন্ত্রের দ্বারা তার সমাধান সম্ভব নয়। কথায় আছে— ‘Short cut, cut you short’। স্বামী বিবেকানন্দ পরাধীন ভারতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ‘আগামী পঞ্চাশ বছর সব দেবদেবীকে তাকে তুলে রেখে দাও, একমাত্র ভারতমাতা হোন তোমাদের আরাধ্যা দেবী।’ স্বাধীনতার পর দেশের পরিস্থিতি দেখে মনে হয় স্বামীজীর কথার প্রাসঙ্গিকতা আজও রয়েছে। সঙ্ঘের শাখায় গৈরিক ধ্বজকে সামনে রেখে স্বয়ংসেবকরা ‘ভারতমাতা কী জয়’ বলার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা লাভ করে যে, আমরা সকলে হিন্দু, আমাদের মধ্যে নেই কোনো ভেদ, আমরা সকলে ভারতমায়ের সন্তান; জাতি-বর্ণ-ভাষার ক্ষুদ্র পরিচয় সরিয়ে রেখে আমরা সকলেই হিন্দু। ভারতমাতা হচ্ছেন পরমারাধ্যা, সমগ্র হিন্দুসমাজ তাঁরই আরাধনারত, গৈরিক ধ্বজ হলো ত্যাগের প্রতীক। সংক্ষেপে এটিই হলো সঙ্ঘের আদর্শ। এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে রাষ্ট্রনির্মাণ হলো মূল কাজ যা সঙ্ঘ শাখার মাধ্যমে নিরন্তরভাবে করে চলেছে বিগত একশো বছর ধরে। ■

শিলিগুড়িতে সংস্কৃতভারতী উত্তরবঙ্গের প্রান্তসমীক্ষা পরিকল্পনা বৈঠক

গত ৩০-৩১ মার্চ, শিলিগুড়ির ঋষি ভবনে সম্পন্ন হলো সংস্কৃতভারতী উত্তরবঙ্গের দ্বিদিবসীয় প্রান্তসমীক্ষা পরিকল্পনা বৈঠক কর্মসূচি-২০২৫। 'এক লক্ষ্য, এক আশা— জন জন ভাষা, সংস্কৃতভাষা', 'সংস্কৃত ভারত, সমর্থ ভারত', এই মহান ঘোষণাগুলিকে হৃদয়ে ধারণ করে, সংস্কৃত ভাষাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার সংকল্প গ্রহণ করে সংস্কৃতভারতী সংস্থা বিগত ৪৪ বছর ধরে সারা ভারতে স্তরে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

নতুন বছরে সংগঠনের কাজের পরিকল্পনা এবং সংস্কৃত ভাষা সম্প্রসারণের জন্য আলোচনা ও প্রচারের মাধ্যমগুলিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আয়োজিত হয় এই বৈঠক। এই পরিকল্পনা গোষ্ঠীতে উত্তরবঙ্গ প্রান্তের শিলিগুড়ি, মালদহ, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিম-সহ মোট ১৪টি জেলার প্রায় ২৫ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বৈঠকের শুভ উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিশ্বপ্রতীম রুদ্র। বৈঠকের সাফল্য কামনা করে তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতভারতীর সর্বভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী শ্রীজয়প্রকাশজী এবং সংস্কৃতভারতী, উত্তরবঙ্গের প্রান্ত ও জেলা স্তরের সমস্ত কার্যকর্তা। আর্যসমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থেকে সংস্কৃত প্রচার-প্রসার কাজকে মহৎ কাজ বলে উল্লেখ করে আগামীদিনে এই কাজে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এই পরিকল্পনা গোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য হলো আগামী এক বছরে সংস্কৃত প্রচারের কাজে আরও গতিসঞ্চার করা। প্রতিটি কার্যকর্তা তাঁদের নিজ নিজ জেলায় দশদিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির, সংস্কৃত শিশু কেন্দ্র, গীতাকেন্দ্র ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্কৃতকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য ও সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করবেন। আগামীদিনে সমাজের বিভিন্ন পেশার ও বিভিন্ন স্তরের মানুষকে এই মহৎ কাজের সঙ্গে যুক্ত করাই সংস্কৃতভারতীর লক্ষ্য। এই বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে সমস্ত কার্যকর্তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি দেওয়া দেওয়া হয়। ছোটো ছোটো বিষয়গুলিকে গভীরভাবে চিন্তন ও সেগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বোঝার পাশাপাশি, সমস্ত কার্যকর্তা তাঁদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। দু'দিন ব্যাপী এই বৈঠক নিশ্চিতভাবে আগামীদিনে উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সমস্ত জেলায় সংস্কৃত ভাষার প্রচারের ক্ষেত্রে নতুন শক্তি সঞ্চার করবে।

গঙ্গা সমগ্র, দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে মহাযজ্ঞ ও নিষাদরাজ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

এই বছর প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে গঙ্গা সমগ্রের উদ্যোগে ৪৫ দিন ধরে ১ লক্ষ ৯০ হাজার স্কোয়ার ফুট এলাকা জুড়ে কুম্ভমেলায় আগত পুণ্যার্থী ও তীর্থযাত্রীদের সেবা শিবির আয়োজিত হয়। গঙ্গা সমগ্রের সাংগঠনিক ইতিহাসে প্রথমবার আয়োজিত হয় এতবড়ো শিবির। এরপর সফলভাবে আয়োজিত হয় গঙ্গা সমগ্রের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা সঙ্গম। গত ২৯ ও ৩০ মার্চ, গঙ্গা সমগ্র, দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে মধ্য হাওড়ার শিবপুর লঞ্চঘাটে অনুষ্ঠিত হয় দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান। প্রথম দিন মাটি দিয়ে ১ লক্ষ ১৫ হাজার শিবলিঙ্গ নির্মাণ, শিবপূজা ও ভগবান শিবের মহারুদ্রাভিষেক-সহ একটি মহাযজ্ঞ আয়োজিত হয়। নিষাদরাজ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড পাঠ করা হয়। হয় মহাগঙ্গা আরতি। দু'দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে হিন্দুসমাজের বহু মানুষ। উপস্থিত ছিলেন গঙ্গা সমগ্রের অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী রামাশিসজী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, সহ-প্রান্ত কার্যবাহ সুনীল সিংহ-সহ বহু বিশিষ্ট সমাজসেবী।

ফঃ ৪

ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির উদ্যোগে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

গত ৩০ মার্চ চৈত্র শুক্ল প্রতিপদের দিন ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির কাঁথি কেন্দ্রের উদ্যোগে একটি নিঃশুল্ক কম্পিউটার কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হলো। ওঁ-ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনের এই মুহূর্তটি আগামীদিনে এই অঞ্চলে নিশ্চিতভাবে জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও আত্মনির্ভরতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক শশাঙ্কশেখর দে, কাঁথি নগর সহ-সেবা প্রমুখ মিলন সাহা, বহু ছাত্র-ছাত্রী ও তাঁদের পরিবারবর্গ, নাগরিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই মহৎ উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তরা বলেন যে, আগামীদিনে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিকাশ ঘটিয়ে যুবসমাজকে দক্ষ ও আত্ম-নির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেন্দ্রটি ভবিষ্যতে অনেক প্রতিভাবান শিক্ষার্থীর স্বপ্নপূরণের সেতু হয়ে উঠবে। শেষে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথি এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

চন্দ্রকোণায় হিন্দু নববর্ষ উপলক্ষ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

গত ৩০ মার্চ হিন্দু নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণারোড- স্থিত সরস্বতী শিশুমন্দিরের উদ্যোগে ছোটো শিশুদের জন্য অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ছবিতে রং করা। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল স্বামী বিবেকানন্দ ও ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের (ডাক্তারজীর) ছবি আঁকা। প্রায় ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সকাল ৮টায় অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বর্ষ প্রতিপদ বা হিন্দু নববর্ষ পালন করা হয়। গৈরিক ধ্বজ উত্তোলন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর বিভাগ প্রচারক রজত রায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি শতবর্ষে সঙ্ঘের করণীয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং শিশুদের

সামনে ডাক্তারজীর জীবনী তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বড়োদের সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার প্রস্তাবের অনুলিপি বিতরণ করা হয়। সঙ্ঘ ও বিচারধারার বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকর্তা-সহ প্রায় ৬০ জন এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু নববর্ষ উপলক্ষ্যে এই দিনটির গুরুত্ব আলোচনা করে সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয় এবং সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে হিন্দু নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তা সম্মেলন

গত ৩০ মার্চ, কলকাতা-স্থিত ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনের ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তা সম্মেলন। দেবী সরস্বতী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে সম্মেলনের শুভ সূচনা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনী সত্রে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাক্তন অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর, বিদ্যার্থী পরিষদের বর্তমান অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক আশিস চৌহান, বিদ্যার্থী বিকাশ ট্রাস্টের সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু বক্সী,অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, উত্তরবঙ্গ-এর সভাপতি ড. বিশ্বজিৎ রায় এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ-এর সম্পাদক অনিরুদ্ধ সরকার। উপস্থিত অতিথিরা সম্মেলনে আগত বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। এই পর্বে সভামঞ্চে উপস্থিত সকলের হাত দিয়ে বাংলায় অনূদিত যশবন্তরাও কেলকর রচিত 'পঞ্চ পরিবর্তন : পূর্ণাঙ্গের দিকে' বইটির উন্মোচন হয়। সত্রটি সঞ্চালনা করেন ড. বিশ্বজিৎ রায়। বইটির বঙ্গানুবাদ করেছেন সুমনচন্দ্র দাস।

সম্মেলনের দ্বিতীয় সত্রে সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুভাষ সরকার, অমিতাভ চক্রবর্তী, রবিরঞ্জন সেন, বিমল দাস,পারুল সিংহ, পি. চন্দ্রশেখর, গোবিন্দ নায়েক প্রমুখ বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তা ও কার্যকর্ত্রী। তাঁদের বক্তব্যে তাঁরা উল্লেখ করেন— ১৯৪৯ সালের ৯ জুলাই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পরিষদের কাজ, পরিষদের কার্যকর্তা হিসেবে তাঁদের অভিজ্ঞতা, অন্যান্য বিস্মৃতপ্রায় কার্যকর্তাদের অবদান, বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃত্বে অনুপ্রবেশ, ছিটমহল বিনিময় সমস্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে শুরু করে শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলন, উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে বাংলা ভাষা রক্ষায় পরিষদের কার্যকর্তা রাজেশ-তাপসের বলিদানের ইতিহাস।

এই সত্রটিকে সঞ্চালনা করেন পরিষদের পূর্বতন কার্যকর্তা মণীন্দ্র করণ। বিদ্যার্থী পরিষদের পূর্বতন ও বর্তমান কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে সভাকক্ষটি ছিল পূর্ণ।

ঠাকুরনগরে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে মহামিলন মেলা

যুগপুরুষ, সমাজ সংস্কারক, আর্ত-পীড়িত-অবহেলিতদের পরিত্রাতা শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১৪তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবারও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরনগরে আয়োজিত হয় মতুয়া সম্প্রদায়ের মহামিলন মেলা, যা বারুণী মেলা নামেও পরিচিত। এই মেলার ইতিহাস জানতে 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)'-এর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রতিনিধি দলের পক্ষে সহ-সম্পাদক জয়ন্ত চক্রবর্তী ও ঠাকুরনগর চর্চাকেন্দ্র প্রমুখ মিঠু বিশ্বাস গিয়েছিলেন পৌঁছে গিয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের অফিসে। মেলা চলাকালীন বহু ব্যস্ততার মাঝে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুরের সহধর্মিণী ও মতুয়া মহাসঙ্ঘের মাতৃসেনার সভানেত্রী সোমা ঠাকুর জানালেন এই মেলা শুরুর কথা ও ঠাকুরনগর পত্তনের ইতিহাস।

তিনি বলেন যে, মতুয়া সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শক শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর বাস করতেন অধুনা বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দিতে। পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য, সামাজিক অস্পৃশ্যতাকে দূর করে মানবধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে মতুয়া সম্প্রদায়ের পত্তন করেন শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান তৈরির মধ্য দিয়ে ভারত বিভাজন হয়। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তাদের ঘরবাড়ি, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হলেন। তাদের ওপর শুরু হয় ভয়াবহ জেহাদি সন্ত্রাস। এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে ভারতে আসতে থাকেন অংসখ্য বাস্তুহারা মানুষ। সেই সঙ্গে মতুয়া সম্প্রদায়ের মূল পরিবারও চলে আসেন ভারতে। হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশধর প্রমথরঞ্জন ঠাকুর লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়েছিলেন। দেশভাগের পর তিনি হাল ধরলেন এই সম্প্রদায়ের। মতুয়া সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ঠাকুরবাড়ির, যা থেকে এলাকার নাম হয়— ঠাকুরনগর। ঠাকুরবাড়িতে একটি পুষ্করিণী রয়েছে, যার নাম 'কামনা সাগর'। কথিত যে, হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথিতে যে স্নানযোগ তৈরি হয়, তাতে মনস্কামনা সহকারে কামনা সাগরে স্নান করলে তা পূর্ণ হয়। সেই জন্য প্রতি বছর সারা ভারতের মতুয়া সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই দিন ঠাকুরনগরে আসেন। পূজা দেন হরি মন্দিরে। এবছরও ঠাকুরের ২১৪তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে সেই মিলন মেলা আয়োজিত হয়। ৭ দিন ধরে চলে এই মেলা। কালের নিয়মে এখন এই মেলা শুধু মতুয়াদের নয়, সকলের মিলনমেলা হয়ে উঠেছে।

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE
8/1/B, Diamond Harbour Road
Kolkata - 700 027, India
www.paharpur.com
CIN : U02005WB1949PLC018363
Ph. +91-33-4013 3000
Dir. +91-33-4013 3403
Fax : +91-33-4013 3499
vswarup@paharpur.com

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বঙ্গের স্বাধীন ও সার্বভৌম নৃপতি

মহারাজা শশাঙ্ক

শশাঙ্ক।

—বলো মা!

—এবার তো যেতে হবে তাই না!

—হ্যাঁ মা। জগন্নাথ ধাম শ্রীক্ষেত্র এখনও অনেকটা পথ। তাই এবার রওনা হতে হবে।

গৌড় অধিপতি রাজা শশাঙ্কর এই কথার পরেই রাজমাতার প্রশ্ন, তা, এদের কথা কিছু ভাবলে?

—কাদের কথা!

—এই গ্রামের মানুষগুলো। যারা আমাদের জন্য এতো করল—ওদের কথা বলছি।

মায়ের কথার উত্তরে শশাঙ্ক পালটা জিজ্ঞাসা, বলো কী করতে চাও তুমি? কী তোমার ইচ্ছা।

—সে কী কথা! তুমি রাজা। প্রজাদের জন্য তুমি কী করবে সেটা তো তোমার জানার কথা। আমি কেবল মনে করিয়ে দিলাম তোমাকে।

রাজধানী কর্ণসুবর্ণ থেকে মা-কে নিয়ে তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছেন রাজা শশাঙ্ক। সেই যাওয়ার পথেই এসে পৌঁছান বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের এই গ্রামটায়। শিবির ফেলেন কিছুটা জিরিয়ে নেওয়ার জন্য। গ্রামের হতদরিদ্র মানুষগুলো তাদের সাধ্যের বাইরে গিয়েও আপ্যায়ন করে সকলকে। তাদের সেই আন্তরিকতায় মুগ্ধ রাজমাতা। তাই যাওয়ার আগে গ্রামবাসীদের জন্য কিছু করার কথা মনে করিয়ে দেন। এর আগেই গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে রাজমাতা জেনেছিলেন তাদের আসল সমস্যার সমাধান করে দেবেন তিনি। কিন্তু কথাটা মনের মধ্যে রেখেছিলেন। দেখছিলেন রাজা হিসেবে তাঁর ছেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে কিনা! তাই বলেছিলেন, রাজা তুমি। প্রজাদের জন্য কী করতে হবে তা তো তুমিই ঠিক করবে। আমি কেন নির্দেশ দেবো!

মায়ের কথার অর্থটা বুঝতে পেরেছিলেন মহারাজা শশাঙ্ক। তাই কথা না বাড়িয়ে গ্রামবাসীদের বলেন, তোমাদের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, ভালো নেই তোমরা। কিন্তু কেন? কীসের অভাব তোমাদের?

গ্রামবাসীরা একসময় ভেবেছিল, রাজাকে বলবে তাদের সমস্যার কথা। কিন্তু ভয় পেয়েছিল। রাজা যদি রেগে যান। যদি ভাবেন, তাদের এই আতিথেয়তা আন্তরিক নয়। এর পেছনে রয়েছে একটা উদ্দেশ্য। তাহলে?

এই তাহলের জন্যই কিছু বলেনি তারা। কিন্তু এখন মহারাজা নিজে যখন জানতে চাইছেন, তখন তো বলতে কোনো বাধা নেই। রাজা তো বাবার মতো। তাঁর কাছে তো সবই বলা যায়। বলা উচিতও। তাই সরব গ্রামবাসীরা। বলে, এখানকার জমি খুবই উর্বর। কিন্তু জলের অভাবে ভালো ফসল হয় না। তাই হাড়মাস এক করে খাটাখাটানির পরও অভাবকে সঙ্গী করেই আমাদের বাঁচা। বৃষ্টির জলের ভরসায় চাষাবাদ আর সবই নিয়তি বলে কপাল চাপড়ানো ছাড়া অন্য উপায় নেই আমাদের।

কথাগুলি শুনতে শুনতে চোখে জল আসে রাজমাতার। তাই যে কথাটা বলতে চাইছিলেন না এতক্ষণ সেটাই বলে ফেললেন, এদের

এই জলের অভাব মেটাবার জন্য কিছুই কি করতে পারো না তুমি?

মায়ের একথার অর্থ বুঝতে দেরি হয় না মহারাজা শশাঙ্কের। তাই কিছু না বলে তিনি নেন ধনুকটা। শর যোজনা করেন তাতে।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভয় পেয়ে যায় গ্রামবাসীরা। অভাবের কথাটা জানিয়ে কোনো ভুল করেনি তো তারা! রাজা ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

রাজমাতা নির্বিকার। আর মহারাজা শশাঙ্ক লক্ষ্য স্থির করেই শর নিক্ষেপ করেন। যেখানে তিরটা মাটিতে গেঁথে যায়, সেই পর্যন্ত জায়গা জুড়ে একটা দিঘি খননের নির্দেশ দেন সঙ্গে সঙ্গে। কেবল নির্দেশ নয়, কাজটা শুরুও করেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। প্রায় ১৫০ একর জুড়ে খোড়া হয় একটি দিঘি। কম করে ৮০টি ফুটবল মাঠের সমান ওটি।

শর নিক্ষেপ করে মহারাজা শশাঙ্ক দিঘির জায়গা ঠিক করে সেটি খনন করেছিলেন বলে তার নাম হয় শশাঙ্ক দিঘি। সেই দিঘির জলে দাঁতনের ওই অঞ্চল হয়ে উঠে সুফলা। আজও টলটল করছে ওই দিঘি। দিঘির পাড়ে এখন এক মন্দির আর মাজার ঘিরে বসে মেলা। আজও এলাকার মানুষ মহারাজা শশাঙ্কের নামে দেন জয়ধ্বনি!

দুই

খুলে যায় কারাগৃহের দ্বার। পায়ের শব্দে চমকে ওঠেন বন্দিনী। তস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন নারী,— কে?

—ভয় নেই। আমি শশাঙ্ক।

—আপনি! আর কী চান আপনি!

নরম গলাতেই বলেন রাজা শশাঙ্ক, কিছু না রানি রাজ্যশ্রী।

রানি! রানি! রানি! ঝলসে ওঠে কণ্ঠ, আপনি কি আমাকে ব্যঙ্গ করছেন?

—মাপ করবেন, আপনাকে ব্যঙ্গ করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নেই আমার।

—তাহলে কেন এসেছেন এখানে?

—একটা কথা শুধু জানতে। এটা আমি চাইনি, মালবরাজ দেবগুপ্ত ঠিক করেনি— আপনাকে বন্দি করে। তার এই কাজের জন্য ক্ষমা চাইছি আমি।

আরও তীক্ষ্ণ কণ্ঠ রাজ্যশ্রী। ক্ষমা আপনাকে। ভীরু! কাপুরুষ! বিশ্বাসঘাতক। অন্যায়ভাবে হত্যা করেছেন আপনি আমার দাদা রাজ্যবর্ধনকে। ক্ষমা আপনাকে কখনোই নয়।

বিব্রতকণ্ঠে শশাঙ্ক বলেন, ভুল-ভুল আপনার এ ধারণা। আমি হত্যা করিনি রাজা রাজ্যবর্ধনকে। অন্যায় করেছিলেন তিনি। সেই অনুতাপে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। বিশ্বাস করুন আমাকে।

—বিশ্বাস! আপনাকে! কখনই নয়! আপনি একজন ঘাতক।

এবার কঠিন কণ্ঠ শশাঙ্কও। বলেন, অন্য কেউ একথা বললে এই মুহূর্তে তার মাথাটা মাটিতে গড়াগড়ি খেত। কিন্তু আপনি নারী। তাই সংযত করছি নিজেকে? আমি কেবল জানাতে এসেছি, মুক্ত আপনি। বাইরে অপেক্ষা করছে শিবিকা। অশ্বও। যেমন আপনার অভিরুচি— তেমন ভাবেই আপনি এখন যেতে পারেন। বলেন তো, সঙ্গে দেহরক্ষী দিয়ে দিচ্ছি।

—করুণা করছেন? আমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিচ্ছেন? সময় যদি আসে তাহলে এর যোগ্য জবাব দেব আমি।

ক্রোধে সিংহিনীর মতোই গর্জন করতে থাকেন থানেশ্বর রাজনন্দিনী, কনৌজরাজ গ্রহবর্মার স্ত্রী রাজ্যশ্রী। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে শশাঙ্ক আবারও বলেন, আপনি এখন মুক্ত। যেতে পারেন যেখানে আপনার অভিপ্রায়। তবে আবারও বলবো, আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আপনার দাদা রাজ্যবর্ধনকে আমি চাইলেই হত্যা করতে পারতাম তাঁর বিশ্বাসভঙ্গের জন্য। কিন্তু আমি তা করিনি। আবারও বলছি, রাজা রাজ্যবর্ধন তাঁর অন্যায়টা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই প্রায়শ্চিত্ত করেছেন জীবন দিয়ে। তবুও বলছি, পারলে আমাকে ক্ষমা করবেন। এখন আপনি আপনি মুক্ত। যেতে পারেন যেখানে খুশি।

কারাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসেন রানি রাজ্যশ্রী। তারপর শিবিকা নয়, বাইরে রাখা সাদা ঘোড়ায় চেপে চলে যান তিনি। তাঁর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে— মহারাজা শশাঙ্ক।

তিন

গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক। দু'চোখে তাঁর স্বপ্ন। সম্রাট হবেন তিনি। উত্তর ভারত হবে তাঁর অধীন। বদলে দেবেন তিনি ইতিহাসের গতি। এতদিন উত্তর ভারত আধিপত্য করে এসেছে বঙ্গদেশের ওপর। সেটাই স্বাভাবিক— সেটাই ভবিতব্য বলে মনে হয়েছে বঙ্গবাসীরও। সেই ধারণাটা এবার বদলে দেবেন তিনি।

এই ভাবনা— মনে মনে এই শপথ নেওয়ার সময় শশাঙ্ক একজন সামন্তমাত্র। মগধের মৌখরি রাজাদের আর পাঁচজন সামন্তর একজন মাত্র। কিন্তু ওই পদে খুশি নন তিনি। বারবারই মনে হয় সামান্য সামন্ত হয়ে থাকার জন্য জন্ম হয়নি তাঁর। আরও অনেক— অনেক বড়ো হতে হবে তাঁকে। আর তারই প্রস্তুতি নিতে থাকেন তিনি— প্রায় প্রকাশ্যেই।

শশাঙ্ক জানেন, পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে কখনই পৌঁছনো যাবে না কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। আর তাই তৈরি করতে থাকেন নিজেকে। প্রথমেই একটা সুশিক্ষিত, সুশৃঙ্খলিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলার দিকে নজর দেন তিনি। নিজে সামনে দাঁড়িয়ে প্রশিক্ষিত করতে থাকেন বাহিনীকে।

প্রাচীনকালের চতুরঙ্গবাহিনীর কথা মাথায় রেখে তিনি পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহী ও গজারোহী বাহিনী তৈরি করেন। সব দিক থেকেই শক্তিশালী করে তোলেন ওই দুই বাহিনীকে। অবশ্য ওইখানেই থেমে থাকেন না শশাঙ্ক। অন্যান্য সামন্তরা সাধারণত যা করেন না সেটাই করলেন তিনি। জলপথে শত্রুর মোকাবিলায় গড়ে তোলেন এক নৌবাহিনী।

শশাঙ্ককে ওই ভাবে শক্তিবৃদ্ধি করতে দেখে আতঙ্কিত হতে থাকেন বঙ্গদেশের অন্যান্য সামন্তরা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেরাই আত্মসমর্পণ করলেন। নেতা হিসেবে মেনে নিলেন শশাঙ্ককে। আর বাকিদের বশ মানালেন তিনি শক্তি প্রয়োগ করে। আর তারই জোরে তিনি সামন্ত থেকে হলেন মহাসামন্ত। হলেন বঙ্গদেশের সর্বময় অধিপতি। হলেন গৌড়াধিপতি। আর তারপরই মন দিলেন রাজ্য বিস্তারে।

প্রথমেই মুখোমুখি কামরূপ রাজ সুস্থিতিবর্মণের। যুদ্ধে নিহত হলেন কামরূপ রাজ। কামরূপ রাজ্যের দুই ছেলেকে বন্দি করে আনলেন বঙ্গে। পরে তাদেরই নিয়োগ করলেন কামরূপে তাঁর সামন্তরাজা হিসেবে।

এরপর তাঁর লক্ষ্য কনৌজ। আর তার জন্য জোট বাঁধলেন মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে। কনৌজের মৌখরিরাজ গ্রহবর্মার বিরুদ্ধে শশাঙ্কর বাহিনীর সাহায্য পেয়ে দেবগুপ্ত এক সংগ্রামে গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করেন। কেবল তাই নয়। বন্দি করলেন গ্রহবর্মার স্ত্রী থানেশ্বরের

পুষ্যভূতি-রাজ যশোবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে।

মিত্র দেবগুপ্তের এই কাজকে কিন্তু সমর্থন করতে পাললেন না শশাঙ্ক। নারী নিগ্রহ তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। কোনো অবস্থাতেই মাতৃজাতির অসম্মান করতে চান না তিনি। কিন্তু তাঁর অনুমোদন ছাড়াই সেই কাজটা করলেন দেবগুপ্ত। থানেশ্বরের সিংহাসনে তখন প্রয়াত যশোবর্ধনের বড়ো পুত্র রাজ্যবর্মন। ভগ্নীপতির মৃত্যু এবং ভগ্নীর বন্দি হওয়ার খবর পেয়ে ভাই হর্ষবর্ধনকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ছুটলেন দেবগুপ্তকে উচিত শিক্ষা দিতে।

শশাঙ্কর বাহিনীর একটি অংশ মালবে থাকলেও তিনি নিজে সে সময় ছিলেন বঙ্গদেশেই। রাজ্যবর্ধনের অভিযানের খবর পেয়ে তিনি রওনা হন কনৌজের পথে। ততদিনে মালব আক্রমণ করেছেন রাজ্যবর্ধন। যুদ্ধে পরাজিত হন দেববগুপ্ত। রাজ্যবর্ধন নিহত করেন তাঁকে। ততদিনে শশাঙ্কও পৌঁছে গেছেন কনৌজে। নগরদ্বারেই অবরোধ গড়ে তুললেন তিনি। মুখোমুখি সেখানেই দুই বাহিনী। দিন দুয়েকের মধ্যেই রাজ্যবর্ধন বুঝতে পারেন, এবারের লড়াইটা বড়ো সহজ হবে না। দেবগুপ্তর মতোই পরাজিত করা যাবে না রাজা শশাঙ্কর বাহিনীকে। হয়তো হার হবে তাঁরই। তাই যুদ্ধ নয়, শান্তির পথ বেছে নিলেন তিনি।

ওই মুহূর্তে শশাঙ্কও সেটাই চাইছিলেন। ফলাফল যখন অনিশ্চিত তখন অকারণ রক্তপাত সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। তাই রাজ্যবর্ধনের সন্ধি প্রস্তাবে অরাজি হলেন না তিনি। সবকিছু সুনিশ্চিত করতে নিরপেক্ষ একটা জায়গায় আলোচনায় বসলেন তাঁরা।

শোনা যায়, শান্তি দীর্ঘস্থায়ী করতেই শশাঙ্ক জামাতা করতে চেয়েছিলেন রাজ্যবর্ধনকে। আর রাজ্যবর্ধনও রাজি ছিলেন কনৌজের অধিকার ছেড়ে দিতে। শেষ হয় আলোচনা। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন দু'জনেই। আলিঙ্গনের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে আলোচনা পর্ব। আর তখনই কেটে গেল সুর— ভঙ্গ হলো তাল-ছন্দ।

রাজ্যবর্ধন ছিলেন পরম বৌদ্ধ। কথায় কথায় স্মরণ করেন তথাগতকে। অন্যদিকে শশাঙ্কও ডাকেন তাঁর আরাধ্য শিবশঙ্কর— মহাদেবকে। এধরনের দুই ধার্মিকের মিলনে তাই অবিশ্বাসের কোনো জায়গা থাকার কথা নয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে রাজ্যবর্ধন হলেন ধর্মচ্যুত। এমনটাই বলেন একদল ঐতিহাসিক।

আসলে অবিশ্বাস ছিল দু'জনেরই মনে। তাই শশাঙ্ক পোশাকের নীচে পরে এসেছিলেন লৌহবর্ম। আর রাজ্যবর্ধন পরিধেয়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন এক তীক্ষ্ণ ছুরি। আলিঙ্গনের মুহূর্তেই অন্তর থেকে অন্তর্হিত তথাগত। সহসা ছুরিটা বের করে সজোরে বসিয়ে দেন শশাঙ্কের বুকে।

শশাঙ্ক এধরনের কোনো ঘটনার জন্য তৈরিই ছিলেন। তাই ঝটিতি একটু সরে গিয়ে পালটা প্যাঁচে মাটিতে ফেলে দেন রাজ্যবর্ধনকে। তারপর যা ঘটল তার জন্য শশাঙ্ক তৈরি ছিলেন না মোটেই।

মাটিতে পড়েই রাজ্যবর্ধন আর্তনাদ করে ওঠেন। হায়— হায় ভগবান তথাগত। এ আমি কী করলাম। কেন আমার মন থেকে অন্তর্হিত হলেন আপনি। এ কোন মহাপাপ করলাম। এ পাপের শাস্তি আমাকে ভোগ করতেই হবে। 'সত্যানুরোধে' মৃত্যুই বরণ করতে হবে আমাকে।

কথাগুলো বলতে বলতে হাতের ছুরিটা দিয়ে কেটে ফেলেন নিজের কণ্ঠনালীটা। ঢলে পড়েন মৃত্যুর শীতল কোলে।

শশাঙ্ক হতভম্ব। এমনটা যে হবে তা তিনি ভাবতেও পারেননি। কিন্তু ওই মুহূর্তে বুদ্ধির খেই হারালেন না। এখানে থাকলে সকলে তো তাঁকেই মনে করবে রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী। তাই তড়িঘড়ি শিবির থেকে বেরিয়ে উঠে পড়লেন ঘোড়ায়। চলে গেলেন সেখান থেকে নিজের সেনাশিবিরে। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুসম্পর্কে প্রায় এমন কথাই আছে হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা তাম্রশাসনে।

রাজ্যবর্ধনের নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে বাণভট্ট বা হিউয়েন সাঙ্ কিন্তু দায়ী করেছেন শশাঙ্ককেই। বাণভট্ট তো তাঁকে 'গৌড়ভুজঙ্গ', 'গৌড়াধম' বলে অভিহিত করেন। তিনি বা হিউয়েন সাঙ যে শশাঙ্ক সম্পর্কে সব সত্য তুলে ধরেননি তা কিন্তু পরবর্তীকালে লিপি ও অন্যান্য তথ্য থেকে প্রমাণিত।

চার

মহারাজা শশাঙ্ক ছিলেন গৌড় সাম্রাজ্যের সার্বভৌম রাজা, গৌড়াধিপ। বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন নৃপতি। মেদিনীপুর থেকে পাওয়া দু'টি লিপি, এগরার আরেক লিপি, গঞ্জামের রাজা মাধব বর্মার তাম্রশাসন (৬১৯ খ্রিস্টাব্দ), হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা ও মধুবন তাম্রশাসন, কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মণের নিধানপুর তাম্রশাসন, শশাঙ্ক নামাঙ্কিত স্বর্ণ ও রত্ন মুদ্রা, বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙের বিবরণ, বৌদ্ধগ্রন্থ আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প ইত্যাদির পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলতে হয়, মহারাজা শশাঙ্ক মোটামুটি ভাবে ৫৯০ থেকে ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। রোহতসগড় থেকে পাওয়া সিলমোহরের ছাঁচে উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁকে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়, তিনি ছিলেন গুপ্তরাজবংশের শেষপর্বের দুর্বল শাসক মহাসেনগুপ্তর মহাসামন্ত।

শশাঙ্ক প্রথমে গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা সুসংহত করে নিজেকে বঙ্গ থেকে ভুবনেশ্বর এবং কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের একজন অধিপতি হন। শশাঙ্কর রাজ্যবিস্তারের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল প্রাকৃতিক সীমান্তের মাধ্যমে রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখা। তাঁর রাজ্যের প্রাকৃতিক সীমা ছিল পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিমে শোনগণ্ডক উপত্যকা, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত।

শশাঙ্ক কনৌজ থেকে বারাণসী পর্যন্ত অঞ্চল জয় করে গাঙ্গেয় উপত্যকায়ও নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন রাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেও তাঁর বোন রাজ্যশ্রী বিন্ধ্যাচলে রয়েছেন শুনে যুদ্ধের ভার সেনাপতি ভাণ্ডীর উপর দিয়ে নিজে যান বোন রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারে।

শেষপর্যন্ত রাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন জয়ী হয়েছিলেন কিনা, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। হর্ষবর্ধন জয়ী হলেও তাতে শশাঙ্কের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তাঁর রাজ্যসীমা তাঁর জীবনকালে অটুটই ছিল।

পাঁচ

পরম ভট্টারক গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ছিলেন শৈব ব্রাহ্মণ সন্তান এমনই অভিমত ঐতিহাসিকদের। অন্যদিকে থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধন প্রথমে শৈব মতাবলম্বী হলেও পরে হন বৌদ্ধমতের পরম পৃষ্ঠপোষক। তাঁর শাসনকালে ভারতে আসা চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙকে অনুগৃহীত করেন তিনি নানাভাবে। বৌদ্ধমতের মহিমা প্রতিষ্ঠায় হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনকে প্রায় তথাগতর আসনে বসান। একই সঙ্গে মহারাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে করেন একাধিক অতিরঞ্জিত অভিযোগ। বৌদ্ধমত

পীড়ক শশাঙ্ককে শাস্তি দেবার জন্য তথাগতই আবির্ভূত হয়েছিলেন হর্ষ-রূপে এমন কথাও বলেন হিউয়েন সাঙ।

মহারাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিরোধী কার্যকলাপ হিসেবে কুশীনগর থেকে বৌদ্ধ বিতাড়ন, পাটলিপুত্র থেকে বুদ্ধপদ-রঞ্জিত পাথর উৎপাটন, গয়ায় বোধিবৃক্ষে অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি নানা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন হিউয়েন সাঙ।

ঐতিহাসিকদের অভিমত, এসব অভিযোগ কেবল অতিরঞ্জিতই নয়, অলীকও। মহারাজা শশাঙ্ক যদি বৌদ্ধ নির্যাতনকারীই হবেন, তাহলে তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণে হিউয়েন সাঙ দশটি সমৃদ্ধ বৌদ্ধবিহার ও সেখানে বসবাসকারী দশ হাজার বৌদ্ধকে দেখলেন কী করে? এই সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েরই-বা চরম উন্নতি ঘটল কী করে? এমন নানা প্রশ্ন করেন ঐতিহাসিকরা।

হিউয়েন সাঙ এমনও লিখেছেন, বৌদ্ধদের ওপর আক্রমণের পাপেই কুষ্ঠ হয় শশাঙ্কের। রোগে তাঁর দেহের মাংস খসে খসে পড়ে।

ঐতিহাসিকদের বক্তব্য, এসবই হিউয়েন সাঙের কষ্টকল্পনা। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, মহারাজা শশাঙ্ক সত্যিই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। রোগমুক্তির জন্য সেসময় আয়োজন করা হয় বিশেষ বৈদিকযজ্ঞের। তার জন্য সরযূনদী তীর থেকে আনানো হয় একদল ব্রাহ্মণকে। সেটাই ছিল বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদের স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রথম ঘটনা। এই ব্রাহ্মণরাই পরবর্তীকালে গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত হন।

ছয়

বঙ্গদেশের ইতিহাসের এক বর্ণময় চরিত্র মহারাজা শশাঙ্ক। এদেশের বহু ঘটনার সঙ্গেই জড়িত ছিলেন তিনি। সেসব ঘটনা আজও মনে করিয়ে দেয় তাঁর কথা। তাঁর নানা কীর্তির অন্যতম বঙ্গাব্দের প্রবর্তন এমন কথাও বলে থাকেন ঐতিহাসিকতা। কিন্তু ভারতভাগের পর থেকেই মুঘল বাদশা আকবরকে এই সম্মান দেওয়ার এক সংগঠিত চেষ্টা শুরু হয়েছে।

ব্যাপারটা প্রথম মাথাচাড়া দেয় গত শতাব্দীর ষাটের দশকে। পূর্ব পাকিস্তানে ড. মহম্মদ শহীদুল্লার নেতৃত্বে গঠিত এক কমিটি বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের কৃতিত্ব দেন বাদশা আকবরকে। বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর সেখানকার জঙ্গিশাসক হোসেইন এরশাদ আবার সরকারিভাবে আকবরকেই বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করেন। আর তারপর থেকেই শুরু হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক।

আকবর দক্ষ প্রশাসক ছিলেন একথা মানেন সকলেই। ধর্মীয় উদারতা ছিল তাঁর প্রশাসনিক কৌশলের একটি অঙ্গ। এমনটা ঐতিহাসিকদেরই একটা বড়ো অংশের ধারণা। একথা সত্য, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য তিনি বেশ কিছু নতুন নীতি নিয়েছিলেন। আবার একথাও সত্য, প্রকাশ্যেই তিনি ছিলেন হিজরি সন এবং দিনপঞ্জীর বিরোধী। আর ওই কারণেই হিজরির পরিবর্তে তারিখ-ইলাহি নামে নতুন এক দিনপঞ্জীর প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই তারিখ ইলাহি দিনপঞ্জী বাতিল করেছিলেন এমন কোনো নজির কোথাও নেই। তাছাড়া মুঘল সাম্রাজ্য ১২টি সুবায় বিভক্ত ছিল। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র বঙ্গের জন্য তিনি আলাদা একটি অব্দ চালু করবেন কেন? আবার সেটা হিজরির সঙ্গেই-বা মিলিয়ে করবেন কেন?

প্রশ্ন আরও আছে, আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি'-তে বহু সালতামামির কথা আছে, কিন্তু বঙ্গাব্দর কথা নেই কোনোখানে। আকবরই বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করে থাকলে আবুল ফজল অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। কিন্তু সেটা না করায় আকবর বঙ্গাব্দের প্রবর্তক এই দাবি টেকে না কোনোভাবেই।

মহারাজা শশাঙ্ক বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেছিলেন এর পক্ষে কিন্তু বেশ কিছু বাস্তব যুক্তি রয়েছে। শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যাভিষেকের বছর ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন বলে উল্লেখ করা হয়। বঙ্গাব্দর সঙ্গে খ্রিস্টাব্দের পার্থক্য ৫৯৩ বছর। এক্ষেত্রে মহারাজা শশাঙ্ক বঙ্গাব্দের প্রবর্তক, এটাই মান্যতা পায়।

আকবরই যদি বঙ্গাব্দর প্রবর্তক হন তাহলে বাঁকুড়া জেলার ডিহারগ্রামে এবং সোনাতপন গ্রামের হাজার বছরের পুরোনো দুটি শিব মন্দিরে ১০২ বঙ্গাব্দের উল্লেখ এল কী করে?

এইসব প্রশ্ন পালটা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসা, বাঙ্গালি আত্মবিস্মৃত জাতি। আসল ছেড়ে নকলের পেছনে ছোটাটাও বাঙ্গালির বৈশিষ্ট্য। বঙ্গাব্দের প্রবর্তনের ক্ষেত্রে মহাক্ষম্র রাজা শশাঙ্ককে অস্বীকার করার ক্ষেত্রেও তেমন মানসিকতারই দায়ী নয় তো? □

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

'সঙ্ঘের এক ও একমাত্র লক্ষ্য হলো সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা'

'শতবর্ষে দাঁড়িয়ে সেই লক্ষ্যপূরণের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে সঙ্ঘ'— ডাঃ মোহনরাও ভাগবত

এই বছর বিজয়া দশমীতে শতবর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে তাঁর প্রবাসে এসেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত। উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তে তাঁর প্রবাস চলাকালীন সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত স্বয়ংসেবকদের বিভিন্ন সমাবেশ ও বৈঠকে যোগদান করেছেন এবং তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। দক্ষিণবঙ্গে তাঁর প্রবাস চলাকালীন স্বস্তিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় দেশ, রাজ্য, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র ও সঙ্ঘের নানা বিষয়ে তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। শতবর্ষের পরিক্রমায় সঙ্ঘ কাজের উপলব্ধি, সমাজ জাগরণে, রাষ্ট্রনির্মাণে স্বয়ংসেবকদের কী করণীয় এবং সেই লক্ষ্য সম্পাদনে তাঁদের প্রয়োজনীয় মনোভূমিকার বিষয়ে নানা বক্তব্য-সহ জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশনা দিয়ে গেলেন পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক।—স্বঃ সঃ

□ ২০২৩ সালে স্বস্তিকা পত্রিকার ৭৫ বছর পূর্তির কার্যক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠে আপনি উপস্থিত ছিলেন। তাতে স্বস্তিকার সঙ্গে যুক্ত সকলেই প্রেরণা লাভ করেছিলেন। এবছর স্বস্তিকা পত্রিকার জন্য আপনার পথনির্দেশ প্রার্থনা করি।

● সমাজ জাগরণের লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ পত্রিকা হলো স্বস্তিকা। স্বস্তিকাতে যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা নিউজ (সংবাদ) ও ভিউজ (মতামত)— এই দু'টি শ্রেণীতে মোটামুটি বিভক্ত। সমাজ জাগরণের বিষয়ে কোনো পত্রিকার করণীয় একটি বিষয় হতে পারে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু ঘটে চলেছে সেই সংক্রান্ত খবরাখবর প্রকাশ এবং সেই সংবাদসমূহের পর্যালোচনা। এই কাজে সমর্পিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া আরেকটি বিষয় হলো, যে কাজগুলি আগে এই পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে হয়নি, সেই ধরনের বিষয়সমূহের বিচার-বিশ্লেষণ। উদাহরণস্বরূপ বঙ্গভূমির ইতিহাস। বঙ্গের ইতিহাস প্রসঙ্গে আলোচনাক্রমে নানা বিষয় উঠে আসতে পারে। যেমন— প্রাচীন যুগের কথা, প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত চলমান ইতিহাসের প্রবাহ, এই দীর্ঘ সময়কালে বঙ্গভূমিকে কী কী সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কীভাবে নানা গুরুত্বপূর্ণ বাঁকের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে বঙ্গের ইতিহাসের গতিপথ, সেই ইতিহাসের আলোচিত বা উপেক্ষিত নায়ক

ফঃ ৫

R. K. WIRE PRODUCTS LTD.

Manufacturers of Wire and Wire Products

Office : Unit No-VII, 15th floor, Tower-I
PS Srijan Corporate Park
Plot No. G-2, Block-EP & GP, Sector-V
Salt Lake City, Kolkata-700 091
(West Bengal) India

With Best Compliments From -

A

WELL WISHER

(A.B.)

কারা ছিলেন, তাঁদের চরিত্র ও আদর্শের স্বরূপ, তাঁদের গুণাবলী ইত্যাদি। এর সঙ্গে আলোচিত হওয়া উচিত বঙ্গভূমির বিভিন্ন প্রান্তের সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব সমূহ। এই ধরনের ভাবনাচিন্তা, গবেষণা এবং পত্রিকায় বিভিন্ন নিবন্ধে সেই সংক্রান্ত লেখালেখিও সমাজ জাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দৈনন্দিন সমাজ জীবনের সাধারণ বিষয়সমূহ উপস্থাপন করার মধ্যে দিয়ে সমাজ জাগরণে একটি পত্রিকা তার ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে পত্রপত্রিকায় উঠে আসতে পারে নানা রাজনৈতিক বিষয়। কেউ এই বিষয়গুলিতে বিশেষ জোরও দিয়ে থাকেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সমাজ জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ হলো— রাজনীতি। রাজনীতির মতোই সমাজ জীবনে আরও অনেক বিষয় রয়েছে। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রত্যহ কী কী ঘটে চলেছে, কী হওয়া উচিত, কী হওয়া উচিত নয়— দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সমাজ জাগরণের ক্ষেত্রে এই প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা জরুরি। এই ব্যাপারে সমাজেরও আত্মোপলব্ধি আবশ্যক। নিজেদের চরিত্র, নিজেদের ঐতিহ্য, পরম্পরা, নিজস্ব বিশেষত্ব, নিজস্ব আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধি সমাজেরও প্রয়োজন। নাগরিকদের মধ্যে সমাজ চেতনা বিকাশে এই দু'টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই স্বস্তিকার কাজ পরিচালিত হওয়া উচিত। এই কাজগুলি কতটা, কীভাবে সম্পন্ন হচ্ছে সেটা দেখার দায়িত্ব আপনাদেরই।

□ সঙ্ঘের শতবর্ষের লক্ষ্য কী? সমাজের প্রতি সঙ্ঘের আহ্বান কী?

● সঙ্ঘের লক্ষ্য সদাসর্বদা এক এবং তা অপরিবর্তিত। সেই লক্ষ্যেই সঙ্ঘ আগাগোড়া অবিচল। সেই লক্ষ্য অর্জন ব্যতীত সঙ্ঘের করণীয় কিছু নেইও। সমগ্র হিন্দুসমাজের সংগঠন হলো সঙ্ঘ। হিন্দুদের সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে চলেছে সঙ্ঘ। শতবর্ষে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সঙ্ঘ এখন এমন একটি পর্যায়ে এসেছে যে হিন্দুসমাজের কাছে প্রতিনিয়ত সঙ্ঘের বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে। এখন হিন্দুসমাজ সঙ্ঘের বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। সমাজকে সঙ্ঘ কী বার্তা দেবে? সমাজকে সংগঠিত হতে হলে কী কী করণীয় সেই বিষয়ে সঙ্ঘকে তার বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। কী কী বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে চলেছে সমাজ, সেগুলি দূর করতে সঙ্ঘ কীভাবে সহায়তা করতে পারে— সমাজ জাগৃতির লক্ষ্যে এই ধরনের বিষয়ে কাজ করে চলা উচিত। কারণ এই কাজ করার ক্ষেত্রে আজ উপযুক্ত হয়ে উঠেছে সঙ্ঘ। তাই সঙ্ঘের করণীয় কাজ সম্পর্কে স্বয়ংসেবকদের অবহিত হওয়া আবশ্যক। কারণ স্বয়ংসেবকদেরই দায়িত্ব সঙ্ঘের উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন। যদিও আগে স্বয়ংসেবকরাই এই দায়িত্ব নির্বাহ করে চলেছেন, কিন্তু সময়ের সঙ্গে এই পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। স্বয়ংসেবকরা যে পথে চলেন বা যে কাজ করেন, সমগ্র সমাজ আজ সেই পথে পরিচালিত হচ্ছে, সেই দায়িত্ব পালন করছে। সঙ্ঘের চর্চায় কোনো বিষয় উঠে এলে বা সঙ্ঘ কোনো বক্তব্য তুলে ধরলে দেশজুড়ে, এমনকী বিশ্বজুড়ে তা প্রবলভাবে আলোচিত হতে থাকে। সঙ্ঘ কাজের বিস্তারের ক্ষেত্রে এটিই তাই উপযুক্ত সময়। হিন্দুসমাজকে সংগঠিত করার লক্ষ্যেই প্রয়োজন সঙ্ঘ কাজের বিস্তার। শতবর্ষে এই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছে সঙ্ঘ, কিন্তু এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নিরন্তর প্রয়াসও জরুরি। এখন সমাজও সঙ্ঘের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে যেতে তৈরি হয়েছে, সঙ্ঘের বক্তব্য শোনার জন্য উদগ্রীব রয়েছে। দেশ-সমাজের কল্যাণ ও রাষ্ট্রহিতের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রহিত সর্বোপরি। সেই অনুযায়ী সমাজে সকলের অবস্থান কী বা কেমন হওয়া উচিত, চলার পথে কী করণীয়, কী করণীয় নয়— সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য সমাজকে পৌঁছে দেওয়া স্বয়ংসেবকদের দায়িত্ব। ২০২৫-এর বিজয়া দশমীতে শতবর্ষ পূর্ণ করবে সঙ্ঘ। তারপর থেকে এক বছর ধরে পালিত হবে সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যক্রম। সেই সময়ে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নই হবে সঙ্ঘের লক্ষ্য। সমাজের কাছে গিয়ে পৌঁছে দিতে হবে সঙ্ঘের বার্তা। শতবর্ষ উদ্‌যাপনের পাশাপাশি সঙ্ঘের কার্যবিস্তারের প্রক্রিয়াও অব্যাহত থাকবে। যত বেশি, যত দ্রুত সম্ভব সঙ্ঘ কাজ বিস্তারের প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। সঙ্ঘের শতবর্ষে পৌঁছে স্বয়ংসেবকদের মনে সঙ্ঘ সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সঙ্ঘ কাজের গতিবৃদ্ধির বিষয়ে চিন্তন-মনন বিশেষ প্রয়োজন।

□ পশ্চিমবঙ্গে নিরন্তর অরাষ্ট্রীয় শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার জন্য সঙ্ঘ কী ভাবছে?

● 'অরাষ্ট্রীয় শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে'—এটির পরিবর্তে বলা উচিত যে রাষ্ট্রবাদী শক্তি কিঞ্চিৎ দুর্বল হয়েছে বা রাষ্ট্রবাদী শক্তির প্রভাব একটু কমেছে। ঠিক যেমন অন্ধকার কোনো বাস্তবতা নয়। আলোর অভাবই হলো অন্ধকার। অন্ধকার দূর করতে আলো হলো একমাত্র বিকল্প। হিন্দুসমাজ অর্থাৎ রাষ্ট্রবোধসম্পন্ন মানুষ রাষ্ট্রবাদী বিচারধারা অনুযায়ী কাজের ক্ষেত্রে সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পালনে যদি কোনোভাবে একটু পিছিয়ে পড়েন, তখন এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। তাই রাষ্ট্রবোধ বিষয়ে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণাসম্পন্ন হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করে, ভেদবুদ্ধি সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রেখে সমগ্র দেশের কল্যাণ সাধনে সকলকে অগ্রসর হতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সকলের ঠিক যেরকম যোগ্য হওয়া প্রয়োজন, তেমনই হয়ে উঠতে হবে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় দৈবগুণসম্পদের কথা বলা হয়েছে। সমাজে আসুরিক গুণসম্পদ বৃদ্ধি পেলে দৈবগুণসম্পদ স্বাভাবিকভাবেই যায় কমে। তাই দৈবগুণসম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বতো ভাবে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রথম দৈবসম্পদ হিসেবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'অভয়ং' অর্থাৎ 'ভয়শূন্যতা'র কথা বলেছেন। নির্ভয়ভাবে সকলকে সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। স্বয়ংসেবকদের বিশেষ দায়িত্ব বর্তায় এমন পরিস্থিতিতে নির্ভয় হয়ে স্বীয় কর্তব্যের পথে অটল ও দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ থেকে এগিয়ে যেতে হবে। কঠিন সময়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো চরিত্র ও মানসিকতার অধিকারী হয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। নেভার সাবমিট টু দ্য ডার্কনেস্। কিপ অন ফাইটিং। এ ডে উইল কাম। সানরাইজ উইল ডেফিনিটিলি কাম (অর্থাৎ, অন্ধকারের সামনে কখনো আত্মসমর্পণ করা চলবে না। নিরন্তর প্রয়াস জারি রাখতে হবে। একদিন আসবে। সেদিন অবশ্যই নতুন সূর্যোদয় হবে)। এই পরিস্থিতিতে সকলের উচিত নিজ কর্তব্য ঠিকভাবে পালনে অবিচল থাকা। দেশের কল্যাণে, লোকহিতে

বেঁচে থাকাই কাম্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধি জীবনের উদ্দেশ্য নয়। সমাজ জুড়ে এই ভাবনা যত ছড়িয়ে পড়বে, ততই দেশ ও সমাজের মঙ্গল। এই ভাবনার প্রচার-প্রসারের কাজ করে চলেছেন প্রতিটি স্বয়ংসেবক। স্বয়ংসেবকদের কাজে সহায়ক হয়ে উঠেছেন সমগ্র সজ্জনশক্তি, অর্থাৎ সমাজের সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। স্বয়ংসেবকদের সহায়তায় সমাজের সজ্জনশক্তি ব্যাপক উৎসুক। সমাজ জাগরণে যা কিছু উচিত— তা শুধু সজ্জনশক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়াই স্বয়ংসেবকেদের কাজ নয়, তা করে দেখানোও সমস্ত স্বয়ংসেবকের দায়িত্ব। এই প্রক্রিয়ায় সজ্জনশক্তির জাগরণ ঘটলে গোটা সমাজ সজ্জনশক্তিকেই তখন অনুসরণ করতে থাকে। অরাষ্ট্রীয় শক্তি বেড়ে উঠছে বলে আমি মনে করি না। রাষ্ট্রবাদী শক্তি হয়তো কিঞ্চিৎ স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

মানুষের শরীরে সব রকম জীবাণুই বাস করে। তার মধ্যে ভালো-খারাপ দু'ধরনেরই জীবাণু রয়েছে। জীবাণুর বাস হলেও মানুষ কিন্তু তাতে অসুস্থ হয় না। মানুষের শরীরের ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা কমে গেলে ক্ষতিকর জীবাণুগুলির বাড়বাড়ন্ত হয়। আর তাতেই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই পৃথিবীতে সজ্জন ও দুর্জন— দুই শ্রেণীর মানুষই সদাসর্বদা বিদ্যমান। দু'টি শ্রেণীর মানুষই সমাজে ১০ শতাংশ করে রয়েছে। ঘোর অমানিশার কালেও সমাজে ১০ শতাংশ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ রয়েছেন। তেমনই সমাজ যখন উন্নতি ও বৈভবের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, সেই পরিস্থিতিতেও সমাজে ১০ শতাংশ দুষ্ট লোক থাকে। বাকি ৮০ শতাংশ সমাজ তখনই রোগাক্রান্ত হয়, যখন ১০ শতাংশ সজ্জন শক্তি নিস্তেজ বা সুপ্ত হয়ে পড়ে। সুপ্ত বা নিদ্রিত অবস্থায় থাকে তখন সমগ্র সমাজ। রাজত্ব চলে দুর্জন শক্তির। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চলতে থাকে যেন এক দুঃস্বপ্ন। তন্দ্রামুক্তি ঘটলে খারাপ স্বপ্ন দেখাও স্বাভাবিকভাবেই শেষ হয়। তন্দ্রাভঙ্গ ও জাগরণের উদ্দেশ্যে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়ে সমগ্র সমাজ যখন অগ্রসর হয়, তখন স্বীয় লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের উপর যখন চতুর্দিক থেকে নানা আক্রমণ শুরু হয়, সেই সময় অন্য কারুর মুখাপেক্ষী না থেকে নিজস্ব সুরক্ষা বিষয়টিকে সমাজকেই সুনিশ্চিত করতে হবে। অন্য কেউ তাকে রক্ষা না করলেও নিজস্ব সুরক্ষার প্রশ্নে তাকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে হবে। সমাজ যখন এই চরিত্রটি পরিগ্রহ করবে বা এই মানসিকতা সম্পন্ন হবে,তখনই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

□ বাংলাদেশের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ কী? এবিষয়ে বাকি হিন্দুসমাজের করণীয় কী?

● আশার কথা একটিই এবং তা হলো বাংলাদেশের হিন্দুরা মনে হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, এবার তাঁরা দেশ ছেড়ে পালাবেন না। তাঁদের মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির লক্ষ্যে তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাবেন। বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে তো হিন্দুরাও সম্মিলিত রয়েছেন। তাই বাংলাদেশের অন্যান্য নাগরিকদের মতোই হিন্দুদেরও রয়েছে সমানাধিকার। সেই দেশে তাঁদের জীবন-জীবিকা অসুরক্ষিত হলে তা ঘোর অন্যায়। এই অন্যায়ের প্রতিকারের দাবিতে আন্দোলনরত হিন্দুরা কঠিন পরিস্থিতিতেও দৃঢ়ভাবে সেই দেশে অবস্থান করছেন। কঠিন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা বা সহযোগিতা হতে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত থেকে কোনোমতেই পিছু হটেননি। এই কারণেই তাঁদের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে বেঁচে রয়েছে আশার আলো। এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা হিন্দুদের একটিই কর্তব্য। তা হলো— বাংলাদেশের হিন্দুদের যেকোনো প্রক্রিয়ায়, যতরকম সহযোগিতা করা সম্ভব, তা করা। তাঁদের প্রতি সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। বিশ্বজুড়ে হিন্দুরা এই বিষয়ে সচেতন হয়েছেন, অবহিত রয়েছেন। বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে তাঁরা ইতিমধ্যেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। এই নির্যাতন বন্ধে মানবাধিকার সংস্থাগুলির মাধ্যমে নানাভাবে প্রয়াস চালাচ্ছেন। এই বিষয়ে বিশ্বের বরেণ্য ব্যক্তি ও বিদ্বজ্জনদের নানা বক্তব্য সামনে এসেছে। নোবেলজয়ী ব্যক্তিরাও প্রতিবাদমুখর হয়েছেন। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা হিন্দুরা বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গত ২৫ নভেম্বর, ২৭ ডিসেম্বর ও ৫ ফেব্রুয়ারি হল্যান্ডের দ্য হেগ শহরে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের সামনে ধরনা ও প্রতিবাদে সম্মিলিত হয়েছিলেন হিন্দুরা। এই সংবাদ সর্বত্র সম্প্রচারিত হয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র এই প্রয়াস চলছে। বিভিন্ন বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যে হিন্দুরা যুক্ত রয়েছেন, তাঁরাও প্রয়াস চালাচ্ছেন অন্যান্য রাজনীতিকদের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করতে। এই আন্দোলনে তাঁদের সমর্থন জোগাড়ের প্রয়াস তাঁরা নিরন্তরভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। মৌলিক অধিকারের দাবিতে বাংলাদেশের হিন্দুদের সংগ্রামের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়ে, সমস্ত আইন-কানুনের এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে যা যা করা সম্ভব, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা হিন্দুসমাজের সেই কাজগুলিই করা উচিত। বাংলাদেশের হিন্দুরা বিশ্বের হিন্দুসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাঁদের প্রতি অন্যান্য হিন্দুদের এটিই হলো মূল দায়িত্ব। হিন্দুরা তাঁদের এই দায়িত্ব পালন করেও চলেছেন। আগামীদিনে এই কাজে তাঁরা অবশ্যই সফল হবেন।

□ বিচার পরিবারের (অর্থাৎ বিবিধক্ষেত্রের) কাজের উপলব্ধি কী?

● বিভিন্ন সংগঠনের প্রান্তের দায়িত্বপ্রাপ্তরা প্রান্তস্তরে কাজের বিষয়টি বিশদে বলতে পারবেন। সঙ্ঘের উপলব্ধির প্রশ্নটি এখানে যুক্ত নয়। কারণ প্রতিটি সংগঠন পৃথক ও স্বতন্ত্র। তারা স্বাধীনভাবে সমগ্র ভারতব্যাপী কাজ করে চলেছে এবং এই কারণে তাদের কাজের বিষয়ে তাদের নিজস্ব উপলব্ধি রয়েছে। অখিল ভারতীয় সংগঠন হওয়ার প্রেক্ষিতে, প্রতিটি সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কর্মধারা ও কাজের অগ্রগতির বিচারে প্রতিটি সংগঠন গোটা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানের অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গেও সংগঠনগুলির কাজ আগে যতখানি ছিল সেখান থেকে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুন সংগঠনগুলির কাজ ধীর গতিতে চলছে বলে কেউ মনে করতে পারেন। আগে ধীরগতিসম্পন্ন হলেও বর্তমানে সংগঠনগুলির কাজের পরিধি দ্রুত বিস্তৃত হয়ে চলেছে। তাঁদের বিচারধারা, সংস্কার ও ব্যবহার বা আচরণের স্বীয় গুণাবলী প্রয়োগে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সমাজের যে যে ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করে চলেছেন, সেই স্বাধীনভাবে পরিচালিত, পৃথক পৃথক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসম্পন্ন বিভিন্ন সংগঠনগুলির কর্মকাণ্ডও অনুরূপভাবে সেই ক্ষেত্রগুলিতে নিত্য প্রসারিত হয়ে চলেছে। দেশজুড়ে সর্বত্র এই চিত্র দৃশ্যমান। পশ্চিমবঙ্গেও

এই চিত্র বিদ্যমান। যে গতিতে অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন সংগঠনগুলির কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে, সেই গতিতে হয়তো পশ্চিমবঙ্গে সংগঠনগুলি ক্রিয়াশীল নয়। কিছু ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতির বিচারে অন্যান্য রাজ্যকে পিছনে ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গ।

কাজের ক্ষেত্রে বাধা-প্রতিবন্ধকতা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, কম-বেশি সর্বত্র রয়েছে। এখানে কোনো এক প্রকারের বাধা হয়তো রয়েছে, অন্যত্র ভিন্ন প্রকারের বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে। সমস্যা, অসুবিধা, বাধা বিপত্তি ছাড়া কোনোদিনই কোনো ভালো কাজ হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে যে পরিস্থিতি রয়েছে তার সঙ্গে কেরালা, তামিলনাড়ু বা পঞ্জাবের তুলনামূলক বিচার করলে বলা যায় যে কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সব জায়গায় রয়েছে। তাই সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা প্রকৃতপক্ষে কোনো বিচার্য বিষয় নয়। বিপদ ও বাধা কাজের গতিকে বাড়াতে বা কমাতে হয়তো পারে। কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্যে স্থির সংগঠনগুলির সংকল্পই হলো যে, তারা তাদের কাজকর্ম অব্যাহত রাখবে। লক্ষ্যে স্থির ও অবিচল থেকে সাংগাঠনিক কাজের বিস্তার ঘটাবে। কাজের গতি সেক্ষেত্রে কম বা বেশি হতে পারে। কিন্তু এই কাজ থেমে থাকতে পারে না। এই কাজের গতি কখনোই রুদ্ধ হয় না। কাজের গতি কেউ রোধও করতে পারে না। সঙ্ঘকাজ পরিস্থিতি-নিরপেক্ষ।

☐ সঙ্ঘের একশত বছরে (রাষ্ট্রনির্মাণের, সমাজ জাগরণের) কাজের উল্লেখযোগ্য সাফল্য কী কী?

● 'সফলতা' শব্দটি আপেক্ষিক। নির্দিষ্ট সময়কালের প্রেক্ষিতে তা তাৎক্ষণিকও বটে। সঙ্ঘের এক ও একমাত্র লক্ষ্য হলো সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা। এই লক্ষ্যপূরণই হলো সঙ্ঘের প্রকৃত সাফল্য। শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই লক্ষ্যপূরণের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে সঙ্ঘ। কুড়ি বছর আগে হিন্দুসমাজের যে অংশগুলিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি অংশে বর্তমানে সঙ্ঘকাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। কুড়ি বছর আগেও সঙ্ঘের মতামত ও বিচারধারা অনেকের কাছেই হয়তো গ্রহণীয় ছিল না। সেই ক্ষেত্রটিতে সাধিত হয়েছে এক আমূল পট পরিবর্তন। বর্তমানে সঙ্ঘকে স্বীকৃতি দিয়েছে সমাজ। কুড়ি বছর আগে সঙ্ঘ কাজের যে পরিসংখ্যান ছিল, তাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই সবরকম দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, নিজস্ব লক্ষ্য অভিমুখে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে সঙ্ঘ।

গত বছরের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমিতে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভব্য মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে যে অসাধারণ ছবি ফুটে উঠেছিল, গত শতাব্দীর '৮০-র দশকে দেশের পরিস্থিতি তা ছিল না। সাম্প্রতিক অতীতে দেশ ও সমাজের চালচিত্রে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে তার মূল কারণ হচ্ছে— সমাজ জাগরণ। অতীতকে অতিক্রম করে জাগ্রত হয়েছে সমগ্র দেশ। শুধুমাত্র হিন্দুসমাজ নয়, এদেশের অন্যান্য নাগরিক, যাঁরা নিজেদের হিন্দু ছাড়া অন্যান্য পরিচয় দিয়ে থাকেন— তাঁদের সকলের জাগরণের সাক্ষী থেকেছে এই দেশ। সমাজ জাগরণের লক্ষ্যে হিন্দুত্বের বিচারধারা ও আদর্শের প্রচার এই দেশে কিছুকাল আগেও ছিল নিষিদ্ধ। হিন্দুত্ব সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনা যেন একপ্রকার পাপ বা অপরাধ বলে গণ্য হতো। আজ কিন্তু 'হিন্দুত্ব' নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী সবাই। সমাজ জাগরণের ফলেই সাধিত হয়েছে এই পরিবর্তন। সমাজের মন ও মানসিকতাকে শুধুমাত্র পথপ্রদর্শন করেছে সঙ্ঘ। সমাজের হৃদয় ও মস্তিষ্ককে দিয়েছে একটি নতুন পথের সন্ধান। সমাজ সেই পথে আকৃষ্ট হয়েছে, সেই দিশায় ধীরে ধীরে ধাবিত হয়েছে। দেশব্যাপী, সমাজব্যাপী সাধিত হয়েছে এই পরিবর্তন। সঙ্ঘের সংগঠন নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো— পরম বৈভবশালী রাষ্ট্রনির্মাণের জন্য যে গুণাবলী প্রয়োজন, সেই গুণযুক্ত সমাজ নির্মাণ বা, স্বীয় আচরণের মাধ্যমে সেই গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশসম্পন্ন সমাজ নির্মাণ। সঙ্ঘের লক্ষ্যের প্রতি অটুট, অবিচল এবং সেই লক্ষ্যপূরণের স্বার্থে জীবন-মৃত্যু সবকিছু সঁপে দেওয়া সমাজ নির্মাণ। সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে সঙ্ঘ। স্বয়ংসেবকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে, শাখার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বয়ংসেবকদের কেন্দ্র করে যে দল বা চক্রগুলি গড়ে ওঠে, যে দলগুলি নিঃস্বার্থভাবে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থাকে— তাদের কার্যকলাপের পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, স্বীয় লক্ষ্যপূরণে অনেকটা পথ অতিক্রম করতে পেরেছে সঙ্ঘ। কিন্তু এখনো অনেক পথ চলা বাকি। কারণ, সম্পূর্ণ সমাজকে সংগঠিত করতে হবে। যাতে কেউ বাদ পড়বেন না। এত বছর ধরে সেই লক্ষ্য অর্জনে পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত ভিত্তিভূমি তৈরি করতে পেরেছে সঙ্ঘ। সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়েই আগামীদিনে লক্ষ্যপূরণে সক্ষম হবে সঙ্ঘ।

সমাজ জাগরণ ও রাষ্ট্রনির্মাণ— দুই ধরনের কাজ অব্যাহত রাখার ফলেই শক্ত ভিতের উপর সঙ্ঘের অবস্থানের বিষয়টি সম্ভবপর হয়েছে। রাষ্ট্রনির্মাণ ব্যতীত সমাজ জাগরণ সম্ভব নয়। রাষ্ট্রনির্মাণের প্রকৃত অর্থ হলো— ব্যক্তি নির্মাণ। অর্থাৎ, রাষ্ট্রবোধসম্পন্ন ব্যক্তি নির্মাণ। 'ব্যক্তি নির্মাণ'-এর পরিমাণ ও পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তি নির্মাণের কাজের অগ্রগতির দরুন সমাজ জাগরণের কাজও স্বাভাবিকভাবেই গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। সমাজের প্রতিটি অংশে সঙ্ঘ কাজ হয়েছে প্রসারিত। সমাজের প্রায় প্রতিটি কোণে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়েছে সঙ্ঘ। এর কারণ ব্যক্তি নির্মাণের কাজে সাফল্যের দরুন কার্যকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি। সঙ্ঘ কাজের প্রতি পূর্ণ সমর্পণই হলো কার্যকর্তাদের জীবনের মূলমন্ত্র। তাই রাষ্ট্রনির্মাণ ও সমাজ জাগরণ— দুটি ক্ষেত্রেই সঙ্ঘ যে অনেকখানি এগোতে পেরেছে তা বলাই বাহুল্য। আগে বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকলাপ প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই আসত না। এখন প্রতিটি সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও বহু ব্যক্তি সঙ্ঘের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সঙ্ঘ কাজের প্রতি রয়েছে তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি। তাঁরা প্রতিনিয়ত করে চলেছেন সঙ্ঘ কাজের নানা বিচার-বিশ্লেষণ। এইভাবে দেশ-বিদেশের বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে সঙ্ঘ। এর কারণ হলো, নিরলস সাধনার মাধ্যমে নিজস্ব কার্যবিস্তারে সাফল্য পেয়েছে সঙ্ঘ, যার পরিণামে সমাজের অভ্যন্তরে সঙ্ঘের প্রভাবও বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে সঙ্ঘের প্রভাব বৃদ্ধির অর্থ সমাজকে জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে সঙ্ঘ। সঙ্ঘের চিন্তাধারার পথের পথিক হয়েছে সমগ্র সমাজ। এই পথে আগামীদিনে সমাজের যাত্রাকে অব্যাহত রাখা, এই দিশায় সমাজকে অনবরত পরিচালনাই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। ☐

নববর্ষ

দৌড়তে দৌড়তে বাড়ির ভেতরে ঢুকেই জিভ বের করে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়িতা। এদিকে মা কটমট করে তাকিয়ে আছে। ঠাকুমা ব্যাপারটা বুঝেই বারান্দার তক্তপোশ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটা খুব সাংঘাতিক নয়, কিন্তু ছোট্ট মেয়েটির ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়াটাও স্বাভাবিক। সেই কোন ভোরবেলা থেকে ঘরদোর মোছামুছি চলছে আর এমন সময় মেয়েটা সবেমাত্র নিকানো উঠোন দিয়ে দৌড়ে গেছে। কাদা মাটিতে পায়ের ছাপ পড়ে যাওয়ায় জিভ বের করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঠাকুমা বলে উঠল, বছরের প্রথম দিনে বকতে নেই বউমা।

পয়লা বৈশাখের জন্য এ যাত্রায় বেঁচে গেল। আস্তে আস্তে শুকানো দিক দিয়ে জয়িতা পৌঁছে গেল ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমা তখন পূজার আয়োজন করছিল, সে এসে ঠাকুমার পাশে বসে দেখতে লাগল ফল, ফুল সাজানো। ঠাকুমা বলেন, দিদুন তুমি আগে স্নান করে নাও, তারপর মালা গেঁথে দিও।

জয়িতার বাবা আর দাদা সকালবেলা বাজারের জন্য বেরিয়ে গেছে। তখন জয়িতা ঘুমের দেশে। আর ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে গেছে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে। সারা গায়ে ধুলোবালি মেখে দৌড়ে বাড়িতে এসে সদ্য নিকানো উঠোনের উপর এসে পড়ে। তার মা পুকুরের পাঁকমাটি, জমি থেকে লাল এঁটেল মাটি আর গোবর জল দিয়ে সুন্দর করে ঘরদোর মোছামুছি করছিল।

একটু পরেই গণেশবাবু বাড়িতে ঢুকলেন দুই হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে। তার পেছন পেছন জয়িতার দাদা জয় কলাপাতা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল। জয়িতা দৌড়ে গেল ব্যাগ ধরতে। বলল, বাবা আমাকে দাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি। বাবার কাছ থেকে একরকম জোর করেই একটা ব্যাগটা নিয়ে বারান্দায় তুলতে না তুলতেই ফেলে দিল। দুটো আপেল গড়িয়ে পৌঁছে গেল জয়িতার মায়ের কাছে। আলপনা দিতে দিতে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, তুই কি শান্তভাবে বসতে পারিস না? সারাদিন শুধু লাফালাফি। যা তাড়াতাড়ি, স্নান করে নে, তারপর পূজায় বসতে হবে।

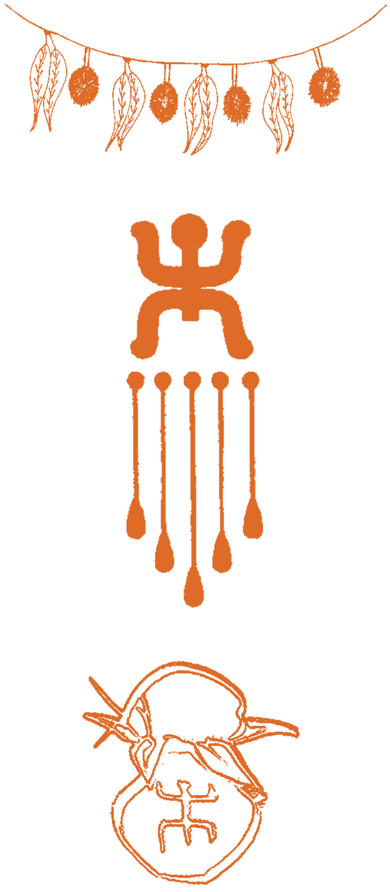

ব্যাগটা রেখে দিয়েই, স্নান করতে চলে গেল। জয়ও একটা গামছা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে চলে গেল স্নান করতে। স্নান করে এসেই দেখে দুই ভাই-বোনের জন্য নতুন জামা খাটের উপর রাখা আছে। নতুন জামা পরে বাইরে আসতেই মা এসে জয়িতার চোখে কাজল পড়িয়ে দিলেন। জয় এল বেশ খানিক পরে। বাড়িতে ঢুকেই পুকুর থেকে আনা পদ্মফুল ঠাকুরঘরের বাইরে রেখে দিল, তারপর ঘর থেকে নতুন জামা প্যান্ট পরে বেরিয়ে এল।

সারা বাড়ি আলপনা দিয়ে সাজানো। দরজায় আমের পাতা দিয়ে ঝালর বানানো হয়েছে। পূজার তখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। জয়িতা এসে ফুলের সাজি থেকে ফুল, দূর্বা আলাদা করে রাখতে শুরু করল। ঠাকুমা উঁচু পিঁড়িতে বসে পূজা শুরু করেছেন। জয়িতা পিছনে এসে বসল। এদিকে তার মা আজকে কত রকমের রান্না করছে আর সেই গন্ধে সারা বাড়িটা ভরে উঠেছে। জয়িতার মন পড়ে আছে সেই রান্নাঘরে।

জয় সাইকেলটা নিয়ে কোথায় গেছিল, বাড়িতে যখন পূজা শেষ হচ্ছে তখন সে একটা ক্যালেন্ডার নিয়ে ঢুকেই জয়িতাকে ডাক দিল, ও বুনু আয় এদিকে। জয়িতা পূজার ঘর থেকে বেরুতেই তার দাদা একটা ঠোঙা তার হাতে দিল। ঠোঙাতে দেখে লাড্ডু, নিমকি আর পূজার প্রসাদ। জয়িতা জিজ্ঞেস করল, কোথায় থেকে আনলি রে দাদা? তুই খেয়েছিস কি? জয় বলল শ্যামল জেঠুর দোকানে হালখাতার পূজা হয়েছে, জেঠু দিতেই তোর জন্য নিয়ে এলাম।

জয়িতা সেই প্রসাদ থেকে দাদাকে একটু দিল। জয় লাড্ডুর টুকরোটা মুখে দিয়েই দেওয়ালে নতুন ক্যালেন্ডারটা লাগিয়ে ফেলল। খুব সুন্দর শিবঠাকুরের ছবি। ততক্ষণে মায়ের রান্না শেষ হয়ে গেছে। রান্নাঘর থেকে জয়িতার ডাক পড়ল। দৌড়ে গেল রান্নাঘরে, তারপর খাবারের জন্য আসন, জল পাততে শুরু করল। বাবা, দাদার সঙ্গে জয়িতাও খেতে বসে গেল। খুব খিদে পেয়েছে, তার উপর কতক্ষণ ধরে শুধুই খাবারের গন্ধ পাচ্ছিল, আর দেরি করা গেল না। মা আর ঠাকুমা পরিবেশন করতে শুরু করল। সকলে চেটেপুটে খেল।

মা, ঠাকুমার খাওয়া হলে সবাই একটা ঘরে এসে জড়ো হলো। জয়িতা এক বছর আগেই গান শিখতে শুরু করেছে। জয়িতার মা হারমোনিয়ামটা বের করে খাটের উপর রাখলেন। জয় তবলা-ডুগি নিয়ে বসে পড়ল। হারমোনিয়ামে সারেগামা বাজিয়েই গান শুরু করল—

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে।

মেলে দিলেম গানের সুরে এই ডানা মনে মনে।...

—সোমকান্তি

জাতীয় উদ্যান

আনশি

আনশি জাতীয় উদ্যান কর্ণাটক রাজ্যের উত্তর কন্নড় জেলায় অবস্থিত। ১৯৮৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই উদ্যান ৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এটি ডান্ডেলি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যেরও অংশ। এখানে শত শত প্রজাতির বন্যজন্তু, পাখি, সরীসৃপ, বৃক্ষ ও ঝোপঝাড় রয়েছে। এই উদ্যান একটি সুপরিচিত ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প। কালীনদীর তীরে উদ্যানটির অবস্থান হওয়ায় এখন কালী টাইগার রিজার্ভ নামে পরিচিত। এই উদ্যানে প্রবেশের জন্য কোনো প্রবেশ মূল্য নেই, তবে সাফারিতে অংশগ্রহণ করতে হলে জনপ্রতি চারশো টাকা দিতে হয়। বিরল ব্ল্যাক প্যান্থার এই উদ্যানের অন্যতম আকর্ষণ।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৬৩

সপ্তমী বিভক্তি: – আকারান্তে স্ত্রীলিঙ্গে
পেটিকা – পেটিকায়াম। বাক্স– বাক্সে
শাখা – শাখায়াম। মালা– মালায়াম। স্থালিকা–স্থালিকায়াম। সঞ্চিকা – সঞ্চিকায়াম।
বার্তা পত্রিকায়াম অস্তি। খবর পত্রিকাতে আছে।
বার্তা কুত্র অস্তি? খবর কোথায় আছে?
অভ্যাসং কুর্মঃ –
ফলম্ স্থালিকায়াম অস্তি। বৃক্ষ বাটিকায়াম অস্তি। শাটিকা উৎপঠীকায়াম্ অস্তি। আভূষণং কপাটিকায়াম্ অস্তি। শয্যা মৃত্তিকায়াম্ অস্তি। শবঃ চিতায়াম্ অস্তি।
প্রয়োগং কুর্মঃ –
সঞ্চিকা, মালা, গীতা, পাঠশালা, সান্দ্রমুন্দ্রিকা, জন্তুশালা, গুহা, মথুরা, দোলা।

ভালো কথা

আমার রাজস্থান ও দিল্লি ভ্রমণ

এবার পূজার ছুটিতে আমি মা-বাবার সঙ্গে রাজস্থান গিয়েছিলাম। প্রথমে আমরা দিল্লি গেলাম। সেখানে কুতুবমিনার আর ইন্ডিয়া গেট দেখলাম। পরেরদিন সকালে রওনা হয়ে দুপুরে রাজস্থান পৌঁছালাম। সেদিনই আমরা গোবিন্দ দেউজীর মন্দির দেখলাম। পরদিন সকালে হাওয়া মহল, যন্তরমন্তর, নাহারগড় দুর্গ, জলমহল দেখলাম। তার পরের দিন পুষ্করে পৌঁছে পুষ্কর সরোবরে স্নান করলাম। বিকেলে উটের মেলায় গিয়ে উটের পিঠে চড়ে ঘুরলাম। পরে জাদুঘরে গিয়ে পুতুলনাচ দেখলাম। আবার দিল্লি ফিরে দিল্লির পুতুলঘর দেখলাম। সেখানে ভাঙা পুতুল ঠিক করার জন্য পুতুলদের ডাক্তারখানাও আছে। এক সপ্তাহ পরে আমরা কলকাতা ফিরে এলাম। এই এক সপ্তাহ খুব আনন্দে ছিলম।

অহনা দে, দ্বিতীয় শ্রেণী,
মহর্ষি বিদ্যামন্দির, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

আমার বাড়ি

সমাদৃতা ঘোষ, পঞ্চম শ্রেণী, ইংলিশ বাজার, মালদা

আমার একটা বাড়ি চাই
লোকালয় হতে বহু দূরে
সেখানে একটা বাড়ি বানাবো
একেবারে মনের মতো করে।
নাইবা পেলাম বড়ো ঘর
নাইবা পেলাম গাড়ি

নাইবা থাকলো টাকাপয়সা
সোনা ভরি ভরি।
সুখ শান্তি ভালোবাসা
থাকবে সম্মান পর্যাপ্ত
থাকবে না কোনো অবহেলা
থাকবে বিশ্বাস যথার্থ।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

NANDA MILLAR COMPANY

Engineers s Consultants
Manufacturers s Exporters

1/2, Chanditala Branch Road,
(Near Behala Chandi Mandir)
Kolkata - 700 053, India
Phone : 24030411
Mobile : 98300 78763, Fax : 91-33-24030411
E-mail : nmc@nandagroup.com
Web Site : www.nandagroup.com

With Best Compliment :-

Promising Exports Ltd.

For Enquiry 96741 78500 / 98363 63300

একটি চিন্তাধারার পূর্ণতা

বলবীর পুঞ্জ

যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নাগপুরস্থিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যালয় রেশিমবাগে গিয়ে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এবং দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন, সেসময় ইতিহাসের একটি চক্র সম্পূর্ণ হয়। একশো বছর আগে যে চিন্তাধারার বীজ ডাক্তারজী রোপণ করেছিলেন, তা আজ সহস্র শাখা-প্রশাখার বিরাট স্বরূপ নিয়ে দেশ-বিদেশের জনমানসকে প্রভাবিত করে চলেছে। প্রসঙ্গটি এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, ১৯২৫-এ স্থাপনা থেকে আজ পর্যন্ত সঙ্ঘকে অনবরত উপেক্ষা, তিরস্কার ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। আজ শাসনতন্ত্রের শীর্ষপুরুষ কেবলমাত্র সঙ্ঘের প্রতি নিজের নিষ্ঠা প্রকট করেছেন তা নয়, বরং রাষ্ট্র নির্মাণে সঙ্ঘের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

১৯২৫ সালে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় বিজয়াদশমীর দিন নাগপুরে, অপরদিকে সিপিআই সেই বছরই ক্রিসমাসের সপ্তাহে কানপুরে স্থাপিত হয়। কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হলেও এর সূত্রপাত হয় ১৯২০ সালে তৎকালীন সোভিয়েত দেশে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আগে ডাক্তারজী বিদর্ভ কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক ছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার কারণে তাঁকে ১৯২১-২২ সালে কারাবরণ করতে হয়েছিল। সেসময় বামপন্থী শীর্ষ নেতাদের মধ্যে একজন যিনি স্বাধীন ভারতে নির্বাচিত হয়ে বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন সেই ইএমএস নম্বুদ্রীপাদও কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কমিউনিস্টদের চিন্তাধারা মূলত কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলসের সঙ্গে স্বৈরাচারী লেনিন, স্তালিন ও মাও সে তুং-এর দ্বারা প্রেরণাপ্রাপ্ত। এর কারণেই যে আজকেও তারা ভারতের প্রতিটি সমস্যাকে বিদেশি দৃষ্টিকোণে দেখে এবং তার সমাধানের চেষ্টা করে হয়। ১৮৫৩ সালের ২৫ জুন 'নিউইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন'-এ মার্কস লেখেন, 'আমাদের এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এই ছোটো গোষ্ঠীগুলি জাতিগত ভেদাভেদ এবং দাসত্বের মতো কুরীতিতে ডুবে ছিল। তা মানুষকে পরিস্থিতির উর্ধ্বে ওঠার পরিবর্তে তাকে বাহ্যিক পরিস্থিতির অধীন করে দেয়... এর বড়ো উদাহরণ হলো প্রকৃতির অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ হনুমান (বানর) ও শবলার (গোরু) কাছে শ্রদ্ধায় নতমস্তক হওয়া শুরু করে দেয়।' মজার বিষয় হলো যে, মার্কস ভারতের মূল সনাতন সংস্কৃতির বিষয়ে এই অপপ্রচার করেন, যদিও কখনোই তিনি ভারতে আসেননি। এই চিন্তাধারাকে মার্কসের তল্পিবাহকরা স্বাধীন ভারতে এখনো বয়ে নিয়ে চলেছে।

ভারতীয় চিন্তাধারা একেবারেই আলাদা। সনাতন সংস্কৃতি হলো মানুষ প্রকৃতি ও ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি নয়, বরং তার অংশ। ভারতের আধ্যাত্মিক ধারণাকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ 'ভারতমাতা' রূপে দেখে; অপরদিকে

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

কমিউনিস্টদের কাছে ভারত এমন ভূখণ্ড, যার ভাষা, সম্প্রদায়, এলাকাভিত্তিক বিভাজন করা যেতে পারে। যেখানে সঙ্ঘের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে গান্ধীজী এবং অন্যেরা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বিভাজনের বিরোধিতা করেছেন, সেখানে কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ ও মুসলিম লিগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাকিস্তান তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করেছে। স্বাভাবিকভাবে সঙ্ঘকে ইংরেজ সরকারের শাসক ভালো চোখে দেখত না। ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে ইংরেজ অধীনস্থ কর্মচারীদের সঙ্ঘে যুক্ত থাকার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা বিদেয় হওয়ার পর এই মানসিকতা স্বাভাবিকভাবে বদলানোর কথা ছিল। কিন্তু তেমনটা হলো না, কেননা স্বাধীন ভারতের প্রশাসনিক ক্ষমতা সেই ভারতীয়দের হাতে চলে যায়, যারা চিন্তাধারায় ঔপনিবেশিক এবং সনাতন সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে গান্ধীজীর হত্যার পর মার্কসবাদ ও ঔপনিবেশিক মানসিকতায় প্রভাবিত জওহরলাল নেহরু সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধে সঙ্ঘের নিঃস্বার্থ ও সমর্পিত রাষ্ট্রসেবা দেখার পর প্রধানমন্ত্রী নেহরু তার ভুল বুঝতে পারেন এবং ১৯৬৩ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে সঙ্ঘকে আমন্ত্রণ জানান। এর পর ইন্দিরা গান্ধী রাজনৈতিক কারণে জরুরি অবস্থা জারি করে সঙ্ঘের উপর (১৯৭৫-৭৭) নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই মানসিকতার পুনরাবৃত্তি বাবরি ধাঁচা ধূলিসাৎ হওয়ার পর ১৯৯২-৯৩ সালেও দেখা যায়।

কংগ্রেস ইউপিএ-র সময়কালে (২০০৪-১৪) বিকৃত তথ্যের ভিত্তিতে সঙ্ঘ-বিজেপিকে অভিযুক্ত করার জন্য মিথ্যা 'গৈরিক সন্ত্রাস'-এর অপপ্রচার শুরু করে কংগ্রেস।

প্রত্যেকটা সংগঠনের জন্ম সেই সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে হয়ে থাকে। সঙ্ঘ এর ব্যতিক্রম। সঙ্ঘ কোনো প্রতিক্রিয়াজাত নয়। সময়ের আহ্বানে সঙ্ঘের সৃষ্টি। সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি ও উদ্দেশ্যকে তাৎকালিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে না। ভারতের সঙ্গে বিশ্বের বাকি অংশের প্রতি সঙ্ঘের ব্যাপক দৃষ্টিকোণ সনাতন বৈদিক সিদ্ধান্ত— 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি', 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ' ইত্যাদি শাশ্বত মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই চিন্তাভাবনা মাথায় রেখে সঙ্ঘ বিগত ১০০ বছরে একতা, সামঞ্জস্য এবং রাষ্ট্রের পুনরুত্থানের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

সঙ্ঘ স্বয়ং রাজনীতি থেকে দূরে থাকে। কিন্তু এর দ্বারা প্রদত্ত চরিত্র নির্মাণের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত কার্যকর্তারা কেন্দ্র সরকার এবং বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার পরিচালনা করছেন। এই অভিনব সম্পর্ককে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও চাণক্যের সহযোগের প্রকাশ মনে করা যেতে পারে। এই আলোকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রশংসা করে সঙ্ঘের সম্পর্কে বলেন, 'অমর সংস্কৃতির মহান বটবৃক্ষ হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'। গত মাসে এক আমেরিকান পডকাস্টারের কাছে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী মোদী ঠিকই বলেছেন, 'সঙ্ঘকে বুঝতে পারা এত সহজ নয়।' বাস্তবে, সঙ্ঘ কোনো সংগঠন নয়, বরং একটি চিন্তাধারা, একটা চেতনা এবং সতত প্রবহমান রাষ্ট্রভাবনায় ভরপুর এক আন্দোলন, যার ধ্যেয় পন্থ-সম্প্রদায়-জাতির সংকীর্ণ সীমানার ঊর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ সমাজকে সংগঠিত করা, তাকে আত্মনির্ভর, স্বাভিমানী ও রাষ্ট্রানুকূল করে তোলা। সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতির ভিত্তি অবশ্যই আধ্যাত্মিক। কিন্তু এতে নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী বা যে কোনো উপাসনাপদ্ধতি অনুসরণকারী যুক্ত হতে পারেন।

সঙ্ঘের বাস্তবিকতা এবং স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য করা হয় কেন? কেননা শুরু থেকেই সঙ্ঘ নীরবে থেকেই কাজ করছে এবং প্রচার থেকে বরাবর দূরত্ব বজায় রেখেছে। এই কারণেই সঙ্ঘ বিরোধীরা প্রায়ই তাদের অপপ্রচারে সফল হয়। শতাব্দীবর্ষে সঙ্ঘ এই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করবে আশা কার যায়।

(লেখক একজন প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

With Best Wishes :-

Radha Electricals Private Limited

Factory :

Jalan Industrial Complex

Gate No. 3, Mouza - Beniara, P.S.- Domjur

Dist. - Howrah - 711 411

With Best Compliments From :

EPC Electrical Private Limited.

71A, Tollygunge Road, Kolkata - 700 033

Phone :- 24241240/ 7108, M: - 9748571413

E-mail : epc@epcfans.com

Website : www.epcfan.in

Manufacturer of

Heavy Duty Exhaust Fans, Air Circulator, Mancooler, Axial Flow Fan, Motor

WE HAVE DEALERS ALL OVER INDIA

সংকটের সেই দিনগুলি

বংশীলাল সোনী

১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার অপরাধে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল। এরপর এখানে ক্ষেত্র প্রচারক হিসাবে এলেন একনাথজী (একনাথ রাণাডে)। তিনি পঞ্জাব থেকে তিনজন প্রচারক এনেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম রাম সিংহ ঠাকুর ও বাবুরাও পালধিকর। একনাথজী পুণে থেকে এনেছিলেন সাতজন প্রচারককে। তার মধ্যে কেশবজী (কেশবরাও দীক্ষিত) একজন। আরও সাতজনকে আনলেন তিনি নাগপুর থেকে। কয়েকজন বাঙালি প্রচারক যেমন অমলদা (অমল কুমার বসু), জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিভাস ব্যানার্জিকে এনেছিলেন।

আমি প্রচারক হয়েছি ১৯৫০ সালের ৭ জুলাই। ১৯৫২ সালে আমাদের প্রচারকদের যে বৈঠক হয় তাতে পশ্চিমবঙ্গে ৩৯ জন প্রচারক ছিলেন। প্রথমে কাজ বেশ ভালোভাবেই শুরু হলো। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে শ্লথ হয়ে এল। ১৯৫৪ সালে এখানে সঙ্ঘের কাজ প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গেল।

গুরুদক্ষিণা কমতে শুরু করেছে, গান্ধী হত্যার অভিযোগের ফলে অনেক অভিভাবক নিজের ছেলেদের ক্রমে ক্রমে গুটিয়ে নিচ্ছেন। নতুন ছেলেদের আসাও বন্ধ হয়ে গেছে। আমার বেশ মনে আছে যে ১৯৫৬ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গে আমরা মাত্র ১২ জন প্রচারক কাজ করেছি। কলকাতায় ৬ জন। আর বাকি জেলায় ৬ জন। সমগ্র উত্তরবঙ্গে আমি একা ছিলাম। নদীয়া-মুর্শিদাবাদে ছিলেন অহীন্দ্র কুমার দে। ভুবনেশ্বর দাস যিনি কোচবিহারে ছিলেন তাঁকে এনে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়াতে দেওয়া হয়েছিল। সে বছর কলকাতার গুরুদক্ষিণা হয়েছিল ১৪ হাজার ৪০০ টাকা। তারপর দার্জিলিং জেলার হয়েছিল ৬৩০ টাকা। মাননীয় অমলদা সমস্ত প্রচারকদের সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'বংশী সেকেন্ড'। তখন এমন অবস্থা যে দু'বছর ধরে প্রচারকদের বৈঠক হয়নি। কারণ কে ভাড়া দেবে। কে আসা যাওয়ার খরচ দেবে? অমলদা তখন ছিলেন প্রান্ত প্রচারক। তখন কলকাতার কার্যালয় ২৬ নং বিধান সরণিতে, কোনো রান্নাবান্না হতো না। অমলদা সমস্ত প্রচারকদের ডেকে বললেন, ভাইয়েরা, এই অবস্থায় আমি আর চালাতে পারছি না। তোমরা নিজেরা কোনো কাজকর্ম করে যদি চলতে পারো তো প্রচারক থাকো, না হলে যে যার বাড়িতে চলে যাও।

আমার মনে আছে মণিমোহন কর্মকার তখন জলপাইগুড়িতে ঘড়ি মেরামতের কাজ করে সঙ্ঘের শাখা চালাতেন। আমার দাদা অনন্তদা প্রচারক ছিলেন। কিন্তু কলকাতায় বাঙুর ব্রাদার্সে চাকরি করতেন নিবাসে থেকে। সেখান থেকে যে টাকা আনতেন তাতে কয়েক জন প্রচারকের খাওয়ার খরচ চলত। তখন এইরকম অবস্থা চলছিল।

১৯৫৮ সালে পূজনীয় শ্রীগুরুজী এসেছিলেন মালদায়। লোকেদের এখন বিশ্বাসই হবে না যে তাঁর অনুষ্ঠানে

উপস্থিত ছিল মাত্র ২২ জন তরুণ আর ২৩ জন বালক। নাগরিকদের মধ্যে ৬ জন ভদ্রলোক আর মায়েদের মধ্যে ৪ জন। কিন্তু তাতেও শ্রীগুরুজীর প্রায় সওয়া ঘণ্টা ভাষণ হয়েছিল। সেই সময় শিলিগুড়িতে ও কোচবিহারে তিনি গিয়েছেন। ওই মালদাতে ১৯৬৮ সালে পূজনীয় গুরুজী যখন এসেছিলেন তখন স্বয়ংসেবকদের ১,৬০০ সংখ্যা ছিল। স্টেডিয়ামে কার্যক্রম হয়। ৪ হাজার নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। অথচ ১৯৫৮ সালে ছিল ওইরকম দীনহীন অবস্থা। একজন সাধারণ কার্যকর্তার বাড়ির বাইরের ঘরে শ্রীগুরুজীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু প্রচারকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল যথেষ্ট। ওই যে বললাম গুরুদক্ষিণা উঠেছিল ৬৩০ টাকা। তা ওই টাকায় এক বছর চালাই কী করে! তখন শিলিগুড়ি কার্যালয়ের ভাড়া ছিল ৩৬০ টাকা। তা এক বছরের ভাড়া আগে দিয়ে দিলাম। কী জানি! মাঝখানে যদি ভাড়া না দিতে পারি তো কার্যালয় হয়তো ছেড়ে দিতে হবে। বাকি রইল ২৭০ টাকা। সেই সময় জলপাইগুড়ির যিনি প্রচারক ছিলেন তিনি এসে ধরনা দিয়ে বসে গেলেন। তাঁর কার্যালয়ের ভাড়া ছিল ১০ টাকা। তাও ৬ মাস ভাড়া দিতে পারেননি। বাড়ির মালিক চরম হুমকি দিয়েছিলেন এই বলে যে কালকের মধ্যেই যদি ভাড়া মিটিয়ে না দেওয়া হয় তো জিনিসপত্র তুলে ফেলে দেওয়া হবে। সুতরাং ওই প্রচারক নিয়ে গেলেন ৬০ টাকা। কী আর করব! পঞ্জাবি হোটেলে গিয়ে খেলাম। তখন সাড়ে বারো আনা লাগত সেখানে খেতে। কী করি কী না করি ভেবে পাই না। সাইকেল কেনার পয়সা পর্যন্ত নেই। পুরনো সাইকেল যদিও একটা পাওয়া গেল, ১৩৫ টাকা দাম। হাতে তো মাত্র ২১০ টাকা সম্বল। কিনব কী দিয়ে। দু'মাইল হেঁটে যেতাম, শিলিগুড়ি জংশনের ওপারে গিয়ে যেখানে কুলিরা খায় সেখানে খেতে শুরু করলাম। ৪টে রুটি ৪ আনা, আর ১ আনার তরকারি—৫ আনার খেয়ে ফের হেঁটে হেঁটে আসতাম।

এই রকম একটা বিষম পরিস্থিতিতেও কিন্তু বিশ্বাস, শ্রদ্ধা অটুট ছিল। আর মাননীয় একনাথজীর যে প্রেরণা ছিল তার ফলেও কার্যত ১৯৫৮ সালের পর থেকে সঙ্ঘের কাজ আবার বাড়তে শুরু করল। সেইসব দিনগুলোর স্মৃতিকথা যখন মনে পড়ে তখন একটা অদ্ভুত আনন্দের অনুভব হয়, শিহরণ জাগে। আমার মনে আছে মালদা কার্যালয়ের ভাড়া ছিল ২০ টাকা। বছরে ২৪০ টাকা। তখন আর কী করব, সাবলেট করলাম। একটা অংশকে ১২ টাকায় ভাড়া দিলাম। ওখানকার গুরুদক্ষিণা ছিল ২২০ টাকা, তা ৮ টাকা মাসে মানে বছরে ভাড়া লাগল ৯৬ টাকা। এই অবস্থার মধ্যে এক সময় কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, তখন বিশেষ করে ১৯৫৬ সালের পর থেকে সঙ্ঘের মধ্যে যে সমস্ত স্বয়ংসেবকরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে কোনোরকম হীনম্মন্যতা বা আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল না।

আজ যখন এসব কথা বলছি, তখন সেদিনের স্মৃতি বার বার মনে উদয় হচ্ছে। তখন কিন্তু এসব কথা কখনো মনেও আসত না। আমার ভাইয়েরা যখন জানতে পারল আমি একবছর প্রায় একবেলা খেয়ে দিন কাটিয়েছি তখন তারা বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছে, এতদিন এসব কথা বলোনি কেন? এই বাড়ির ছেলে হয়ে তুমি এত কষ্ট সহ্য করেছ, ইত্যাদি। আমি হেসে বললাম, তাহলে তোমরা বলতে বেচারা সঙ্ঘ খেতে দিতে পারে না, সেখানে তুমি সঙ্ঘের প্রচারক হয়েছ! অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি একদিন পশ্চিমবঙ্গে এই পরিস্থিতির মধ্যেও সঙ্ঘের দিন কেটেছে। সেই তুলনায় এখন তো ভগবানের কৃপায় অনেক ভালো অবস্থা।

[*লেখক প্রয়াত প্রবীণ প্রচারক*]

With Best Compliments

from -

A

Well

Wisher

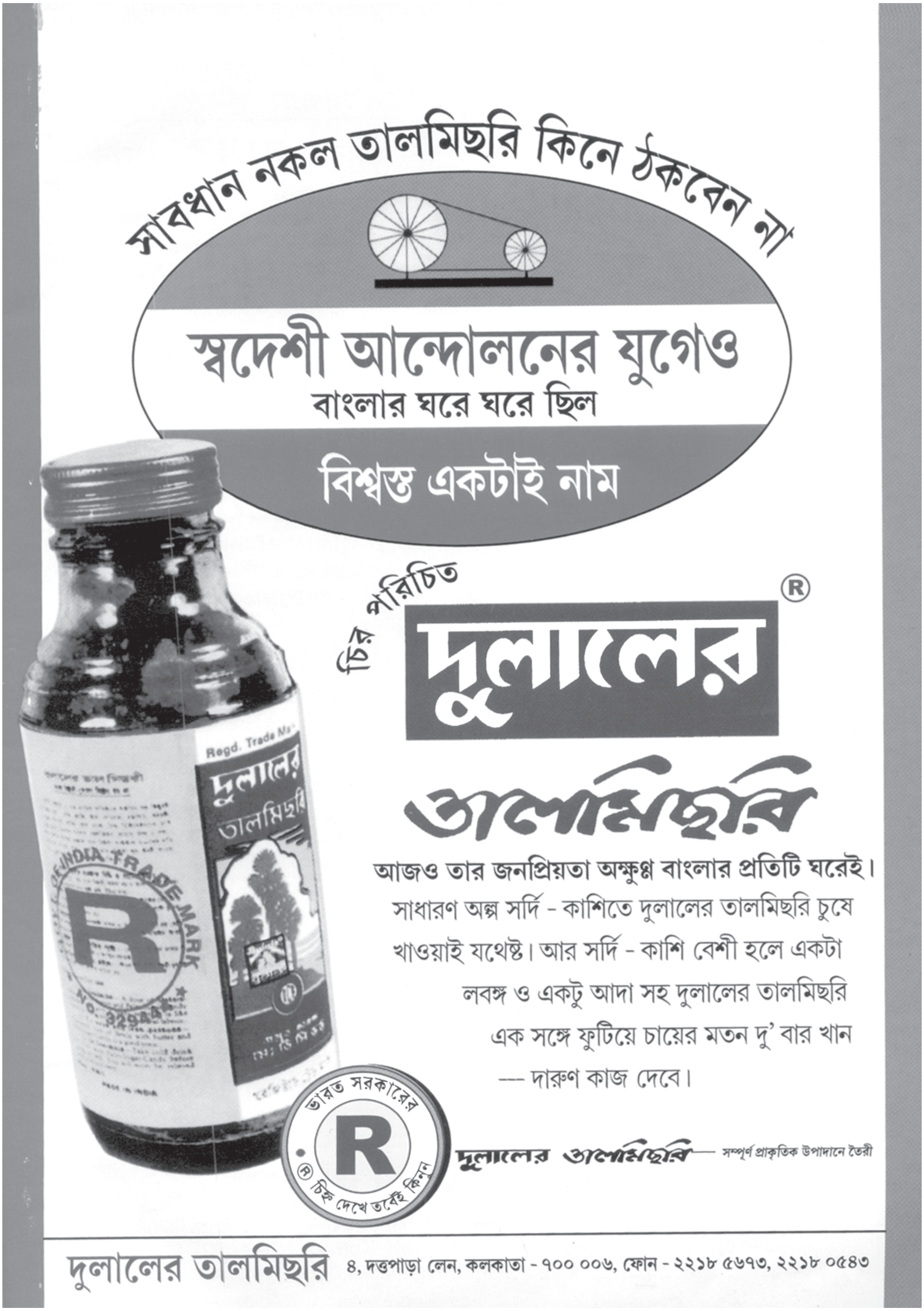
সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
ভারত সরকারের
R
® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি 8, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

With Best Compliments
From :

Wadhwana

"Park Center"
24, Park Street, Kolkata - 700016
Phone :2229-8411/1031/4352,
9830023763
e-mail : wadhwana24@hotmail.com

With Best Compliments
From :

LEADSTONE INTERNATIONAL LLP.

19, R. N. Mukherjee Road,
1st Floor, Kolkata 700 001
Ph. +91 33 2248 1789/ 1790
Email : leadstone.intl@gmail.com

With Best
Compliments From :-

Rajesh Kankaria

With Best Compliments
From -

UMESH GANERIWALA